MARTIN-BURN LIBRARY.
No.
12, Missi...

আত্ম-কথা

আত্ম-কথা

প্রমথ চৌধুরী

১৩৫৩

দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড

প্রকাশক
বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড
২২-১ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩
দাম আড়াই টাকা

মুদ্রাকর
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত

সুহৃদ্বরেষু—

প্রকাশকের নিবেদন

'আত্ম-কথা' প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল তিন বৎসর আগে। একাধিক অনিবার্য্য কারণে বিলম্ব ঘটেছে বলাই বাহুল্য। তবু শেষ পর্য্যন্ত যে আমরা নানান অসুবিধা ঠেলে 'আত্ম-কথা' প্রকাশ করতে পেরেছি তাতে যুগপৎ শ্লাঘা এবং আনন্দ বোধ করছি। আশা করি আমাদের আনন্দ ও শ্লাঘা সুধী পাঠক-গোষ্ঠীর স্বীকৃতি পাবে এবং তাঁরা আমাদের বিলম্ব-জনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

প্রকাশিত 'আত্ম-কথা'য় লেখক তাঁর বিলেত পৌছবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক পর্য্যায়ে লিখেছেন।—অর্থাৎ পরবর্ত্তী পর্য্যায় পরে প্রকাশ হবে এমন আশা করা যেতে পারে। লেখকের স্বাস্থ্য অনুকূল হলে সেটা বোধ করি অদূর ভবিষ্যতেই সম্ভব হতো। তবু এ-বিষয়ে আমরা যথাবিধি অবহিত থাকবো।

'আত্ম-কথা'য় মুদ্রণ-প্রমাদ ছাড়া অন্যান্য ছোটখাটো ত্রুটিও কিছু থেকে গেল। অবশ্য তাতে পাঠের ব্যাঘাত ঘটবে ব'লে মনে হয় না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭।

ভূমিকা

অল্লায়ু 'রূপ ও রীতি' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'আত্মকথা' নাম দিয়ে তাঁর প্রথম জীবনের যে স্মৃতিকথা লিখছিলেন গ্রন্থাকারে তা প্রকাশ হ'লো। বাঙালী পাঠকের আনন্দের কারণ। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় সাময়িক কৌতূহল মিটিয়ে লোপ হওয়ার লেখা এ লেখা নয়।

যে প্রমথ চৌধুরিকে দেশের শিক্ষিত সমাজ জানে, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যে নব রীতির প্রবর্ত্তক, বুদ্ধির বিদ্যুৎ-দীপ্ত পরিহাস-রসিক 'বীরবল', সবুজ পত্রের সম্পাদক ও লেখক, যাঁর চমক লাগানো বাকচাতুরী সংস্কারলেশহীন দৃঢ় ঋজু মনের ঈষৎ বাঁকা বহিঃপ্রকাশ—এই আত্মকথা সেই প্রথম চৌধুরির মন ও ভাষার ভিত্তি গড়নের ইতিহাস। প্রমথবাবুর লেখার যারা পাঠক তারা এ বই সাদর কৌতূহলে পড়বে। আর আমার মত যারা তাঁর সাহিত্য-শিষ্য, এবং জ্ঞানে ও অজ্ঞানে আজকের বাংলা সাহিত্যে তাদের সংখ্যা কম নয়, এ আত্মকথা তাদের পরম আনন্দের সামগ্রী। প্রমথ চৌধুরী সেই লেখক যাঁর পাঠকের সংখ্যা বর্ত্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতে হবে বেশী। তাঁর রচনার প্রগাঢ় বৈদগ্ধ, সূক্ষ্ম মননশীলতা, কুজ্ঝটিকাশূন্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে শিক্ষিত সমাজকে যথার্থ সাহিত্যিক আনন্দ দেয় তার পরিধি বর্ত্তমান বাংলা দেশে সংকীর্ণ। অদূর ভবিষ্যতে এ পরিধির বিস্তার যেমন বাড়তে থাকবে প্রমথ চৌধুরির লেখার অনুরাগী পাঠকের সংখ্যাও বেড়ে চলবে। ভবিষ্যতের সেই পাঠকেরা, যারা প্রমথবাবুকে চোখে দেখেনি, এই আত্মকথা অতি মূল্যবান জ্ঞান করবে।

কিন্তু সাহিত্যিকের আত্মকথা হিসাবেই এ বইএর আকর্ষণ নয়। এ আত্ম-কাহিনীতে যে সব ঘটনা ও লোকের বর্ণনা আছে তা এমন নিপুণ রেখায় আঁকা, এমন কৌতুক হাস্যে সমুজ্জ্বল যে নিজ গুণেই তা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। প্রথম বয়স থেকেই প্রমথবাবু মিশেছেন সকল শ্রেণীর নানা লোকের সঙ্গে। আমরা অনেক সময় রহস্য করে বলেছি যে ছয় কোটি বাঙালীর মধ্যে প্রমথবাবু চারকোটি লোককে চেনেন। এবং যার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয় তার শরীর ও মনের চেহারা ও তাঁর ভঙ্গী তাঁর মনে এঁকে যায়। আর মনে করলেই তার শব্দচিত্র অসাধারণ কৌশলে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এর পরিচয় তাঁর ছোট গল্পে ছড়ান রয়েছে। এই আত্মকথা সাহিত্য হিসাবে তাঁর ছোট গল্পের মতই তীক্ষ্ণ ও রসাল।

প্রমথ চৌধুরির লেখা আত্মকথার ভূমিকা লেখা যে আমার পক্ষে কত বড় ধৃষ্টতা, এবং সম্ভব এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলের পক্ষেই ধৃষ্টতা—তা জানি। কিন্তু তবুও প্রকাশকদের প্রস্তাব অস্বীকার করিনি। প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর সাহচর্য্য আমার জীবনের বড় সম্পদ। তা না ঘটলে সম্ভব জীবিকার্জনের উৎসাহে, লোকে যাকে বলে 'কাজ' তাতেই ডুবে যেতাম। আমি বাংলা সাহিত্যে দু ছত্রের নগণ্য লেখক। কিন্তু সে লেখাও লিখতেম না প্রমথ বাবুর সঙ্গে পরিচয় না হ'লে। এক কালে যে নবীনের দল প্রমথ চৌধুরির উৎসাহে ও উপদেশে 'সবুজপত্রে' লিখে লেখক হবার চেষ্টা করেছিল, তাদের সকলের হ'য়ে এই উপলক্ষে আমাদের গুরুকে প্রণাম জানাচ্ছি।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। অতুলচন্দ্র গুপ্ত

কৈফিয়ত

বছর তিন-চার আগে আমার যুবক বন্ধুরা,—যথা, বুদ্ধদেব বসু, অজিত চক্রবর্ত্তী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাকে আমার • আত্ম-কথা • লেখবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। আমি তাতে প্রথমত রাজী হইনি; কারণ আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যার উল্লেখ করলে পাঠকদের কাছে অসাধারণ বলে মনে হবে। শেষটা আমি নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হয়ে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের নব প্রকাশিত "রূপ ও রীতি" নামক পত্রিকায় আত্ম-কথা লিখতে শুরু করি।

আত্ম-কথা লিখতে আরম্ভ করি অতি তুঃসময়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত। পরে তিনি সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। তারপর ১৯৪১ সালে উপর্য্যুপরি আমার নানারকম তুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। প্রথমত উক্ত সালের জুন মাসে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদ বিমানযুদ্ধে ইংলণ্ডে মারা যায়। তারপর ৭ই অগস্টে আমার জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার কিছু দিন পরে ২রা অক্টোবর তারিখে আমার শাশুড়ী ৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, যাঁর আশ্রয়ে বাস করতুম, তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান। তার বছর খানেক পূর্ব্বে তাঁর একমাত্র পুত্র এবং আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপ্রত্যাশিত রূপে যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগ

ক'রে মারা যান। তিনি বয়সে আমার চেয়ে ছোট ছিলেন। তদবধি আমার শাশুড়ীর সম্পূর্ণ স্মৃতিবিলোপ ঘটে। তার কিছুকাল পরে আমি কলকাতা ত্যাগ ক'রে, পৌষমেলার অব্যবহিতপূর্ব্বে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে চলে আসি—জাপানী আক্রমণের ভয়ে। এবং আজ পর্য্যন্ত এখানেই আছি।

মধ্যে গ্রীষ্মকালে দু'মাসের জন্য কলকাতায় ফিরে যাই। তারপর জুনের শেষাশেষি আবার চলে আসি।

আমি কলকাতা থাকাকালীন বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করতে অনুরুদ্ধ এবং স্বীকৃত হই। এখন ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নদেহে শান্তিনিকেতনে বসে গত শ্রাবণ মাস থেকে উক্ত কাগজের সম্পাদনা পাঁচজনের সাহায্যে যথাসাধ্য সম্পন্ন করছি। ইতিমধ্যে গত শ্রাবণ পর্য্যন্ত "রূপ ও রীতি"তে আমার আত্ম-কথা মাসের পর মাস প্রকাশ করেছি। তারপর সে পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেল, আমার আত্ম-কথাতেও ছেদ পড়ল। লোকমুখে শুনতে পাই যে, সে কথা সম্বন্ধে কৌতূহল পাঠকসমাজে আজও আছে। তাই ভরসা ক'রে বিশ্বভারতী পত্রিকায় তার জের টানতে প্রবৃত্ত হলুম।

এক এক সময় ভাবি যে, আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ছেলে, কোন্ পদ্মাপারে আমার দেশ, আর এই চুয়াত্তর বৎসর বয়সে কোথায় উত্তর-রাঢ়ে অর্দ্ধেক মরুভূমির দেশে ঘটনাচক্রে এসে আশ্রয় নিয়েছি!

আমি বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে তাঁর কাগজে আত্ম-কথা যে কেন লিখিনি, তার একটা নাতিহ্রস্ব কৈফিয়ত প্রকাশ করি। তাতে যতদূর মনে পড়ে প্রথমে বলি যে, বাংলা সাহিত্যে আত্ম-কথা লেখার রেওয়াজ নেই। বঙ্কিম আমাদের নববঙ্গ-সাহিত্যে নানা বিষয়ে পথপ্রদর্শক, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখেননি। সর্ব্বপ্রথমে আমার যা বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে, তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। এ বই অতি চমৎকার বই। উক্ত প্রবন্ধে আমি বলি যে, এ বইয়ের ভাষাকে সাত্ত্বিক ভাষা বলা যেতে পারে। তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত এইটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এও রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত নয়, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। যদিচ এর মধ্যে তাঁর বাল্যজীবনের মালমশলা অনেক পাওয়া যায়। তারপর কবি নবীন সেনের "আমার জীবন" প্রকাশিত হয়। এই বইখানি সেন মহাশয়ের জীবনচরিত হলেও একখানি নভেল-বিশেষ। আর সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।

আমি ছেলেবেলায় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আত্মজীবনী পড়ি; তার দু-চার কথা আমার এখনো মনে আছে। তিনি লিখেছেন তাঁর বাল্যজীবনে—

দেলদুয়ারে হচ্ছে জরের মালখানা
বাবুরা দিচ্ছে সাগুদানা—

আর তাঁর বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে, তিনি কর্ত্তার ঘোড়া দেখলে ঘোমটা টানতেন। তারপর অন্য একটি মহিলার লিখিত আর একখানি আত্মজীবনচরিত পড়েছি। সেটি ঢাকা জেলার জনৈক ব্রাহ্মণকন্যালিখিত কেশববাবুর সমাজের ব্রাহ্ম-দলভুক্ত হবার এবং তার সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আনুপূর্ব্বিক ও মনোজ্ঞ বিবরণ। এর থেকে আমার মনে হয় যে, বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী লেখেন শুধু মেয়েরা,—তাও পূর্ব্ববঙ্গের।

উক্ত প্রবন্ধে আরও বলি যে, পাঁচ থেকে শুরু ক'রে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত জীবনের অধিকাংশ স্মৃতি বিলুপ্ত হয়েছে। এখন সেই সব লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার ক'রে আত্মজীবনী লিখতে হলে Goethe-র মত তার নাম দিতে হয় "সত্য ও মিথ্যা"। তবে মনে হয় যে, নিজের জীবনে অতীত ব'লে কিছু নেই। যা আছে, তা একটি প্রকাণ্ড বর্ত্তমান। যদিচ বর্ত্তমান ব'লে একটি মুহূর্ত্তও নেই। যাকে আমরা বলি বর্ত্তমান, সে হচ্ছে অতীত এবং ভবিষ্যতের একটি কাল্পনিক সন্ধিক্ষণ মাত্র।

আত্ম-কথা লিখতে আরম্ভ ক'রে অবধি যে সূত্র ছিঁড়ে গিয়েছিল, তাকে আবার জোড়া দিতে একটা গিঁঠ দিতে হল। এখন থেকে যা লিখব, এই গিঁঠটি হচ্ছে আর প্রস্থানভূমি।

শান্তি নিকেতন
১৯৪২

প্রমথ চৌধুরী

পাবলিক লাই… মাজু, হাওড়া

আত্ম-কথা

যশোর

আমার জন্ম হয় যশোরে, যদিচ আমার বাড়ী হচ্ছে পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। বাড়ী বলতে আমি সেই স্থানই বুঝি, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাস।

এককালে বাঙ্গালীরা গ্রামেই বাস করত। ইংরেজ আমলের প্রথম থেকেই কতক লোক পাড়াগাঁ ত্যাগ করে পাড়াগেঁয়ে শহরে বাস করতে আরম্ভ করলেন,—ইংরেজের চাকরির খাতিরে। আমার পিতাও ছিলেন এই দলের একজন।

এই সব নতুন শহরে তাঁরা অবশ্য শিকড় গাড়েন নি, কারণ ইংরেজের চাকরি করতে হলে ক্রমান্বয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে বদ্‌লি হতে হয়। সরকারের চাকর সব যাযাবরের দল।

আমার জন্মস্থানের বিষয় আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। আমি পাঁচ বৎসরে যশোর ত্যাগ করে নদীয়া জেলায় আসি। সুতরাং যশোরের স্মৃতি আমার অস্পষ্ট। সে শহরের একটি বাড়ী ও দু-একটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। এর বেশী কিছু নয়।

সেই বাড়ীটির কথা আমি বলব—কারণ আমার শৈশব-স্মৃতি সব সেই বাড়ীর সঙ্গে জড়িত।

যে বাড়ীতে আমরা থাকতুম, সে বাড়ীর নাম পণ্ডিতের বাড়ী। বাড়ীটি দ্বিতল আর সুমুখে একটি পুকুর ছিল। পুকুরের ওপারে একটি একতলা বাড়ী ছিল সেটি নাকি পিরালীবাবুদের বাড়ী। তার পাশ দিয়ে গিয়েছিল একটি ছোটো কাঁচা রাস্তা। আর আমাদের বাসার দক্ষিণে পড়ে ছিল খানিকটা মাঠ ; সেই মাঠ পেরিয়ে যেতে হত একটি রাস্তায়, যে রাস্তা দিয়ে নাকি শহরে যেতে হয়। শহরে মাত্র আমি একটি দিন গিয়েছিলুম—শহরে আগুন লেগেছিল তাই দেখতে, চাকরদের সঙ্গে। এ অগ্নিকাণ্ডের কথা আমার মনে আছে।

আর মনে আছে একদিন দুপুরবেলা বাড়ীর সুমুখের পুকুরে একটি পিরালীবাবু দুটি স্ত্রীলোকের কাঁধে হাত দিয়ে স্নান করতে এলেন। এ ব্যাপারে মহা গোলমাল হতে লাগল, কারণ শুনলুম, তিনজনই নাকি সমান মাতাল। পাছে তারা ডুবে মরে—তাই লোকজন সব চেঁচাচ্ছে। কিন্তু তারা স্নান করে উঠে গেল। বাবুটির চেহারা আমার আজও মনে আছে। তাঁর রং ছিল দিব্য গৌরবর্ণ ও শরীর দোহারা। কিন্তু দুটি স্ত্রীলোকের আর যে গুণই থাক, রূপ ছিল না। যদি থাকত তাহলে পিরালীবাবুর চেহারার মত তাদের চেহারাও আমার চোখে পড়ত। আমার যতদূর মনে পড়ে, তাদের মত কালো কুৎসিত ও রোগা স্ত্রীলোক সচরাচর দেখা যায় না।

আমি যশোর শহরের কোনও দ্রষ্টব্য জিনিস দেখিনি, তার

কারণ বোধ হয় সেখানে দেখবার মত কিছু ছিল না। এই সব ভূঁই-ফোঁড় শহরে থাকে শুধু হাল আমলের আদালত, থানা, ইস্কুল ও জেলখানা। আমি যশোরের জেল শুধু বাইরে থেকে দেখেছি। আমার বয়েস যখন চার ও পাঁচের মধ্যে, তখন হরিপুর থেকে নৌকো এসেছিল আমাদের পূজোর সময় বাড়ী নিয়ে যেতে। আমার এই পর্য্যন্ত মনে আছে যে, সন্ধ্যেবেলায় নৌকোতে গিয়ে চড়লুম। যশোরের নীচে ভৈরব নদী দেখলুম যে দাম ও শেওলায় আগাগোড়া ছাওয়া, আর তারই গায়ে রয়েছে খুব উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা বাড়ী; শুনলুম, এই হচ্ছে সে শহরের জেল। এই দামের ভিতর দিয়ে নৌকো কি করে এল তা বুঝতে পারলুম না।

আর মনে আছে সেই রাত্তিরের কথা, যেদিন আমরা যশোর ত্যাগ করি। নিত্য যা ঘটে তা ঘটনাই নয়। একটা অসাধারণ নড়াচড়ার কথা ছোট ছেলেদের তাই মনে থাকে।

আমার বয়েস যখন পাঁচ বৎসর, তখন আমরা যশোর ছেড়ে কৃষ্ণনগর রওনা হই।

যশোরে ছ্যাকড়া গাড়ীতে চড়ে সমস্ত রাত চলার পর বনগাঁয় পৌঁছই, আর সেখানে একদিন এক রাত থেকে পরদিন সকালে আবার ছ্যাকড়া গাড়ীতে চড়ে চাকদহ যাই। আর সেখানেই প্রথম রেলগাড়ী দেখি। সেই রেলগাড়ীতে চড়ে বগুলায় আসি—আবার সেখান থেকে আমরা ছ্যাকড়া গাড়ীতে চড়ে শেষটা কৃষ্ণনগরে আসি।

যশোরের এই চারটি ঘটনা শুধু আমার মনে আছে। প্রথমে অগ্নিকাণ্ড, তারপর পিরালীবাবুর জলকেলি, তারপর যশোর থেকে নৌকাযাত্রা, আর শেষটা যশোর ত্যাগ। বাদবাকী সব অন্ধকার।

যশোরে আমরা অনেকে এক বাড়ীতে থাকতুম। বাবা, মা, পাঁচ ভাই, তুই বোন আর তু-একটি আত্মীয়। এঁদের কারও কথা আমার মনে নেই, একমাত্র আমার অব্যবহিত জ্যেষ্ঠ কুমুদনাথের কথা ছাড়া। এর কারণ বোধ হয় আমরা পিঠপিঠি তু-ভাই একসঙ্গে খেলা করতুম ও বেড়াতুম।

আমাদের বাড়ীতে মুখুজ্যে মশায় নামে একটি লোক থাকতেন। তিনি কে তা আমি জানি নে। তিনি বসে বসে সেতার বাজাতেন। আমাদের পরিবার সঙ্গীতছুট্। অর্থাৎ সঙ্গীতের চর্চ্চা কেউ করতেন না। সুতরাং মুখুজ্যে মশায় সেতারের মাস্টার ছিলেন না। তাঁর সেতারের বোল পরে শুনেছি মার মুখে; সে কথা পরে বলব।

আর আমি একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েছিলুম। একটি বালিকাকে আজও মনে আছে। মেয়েটি ছিল শান্তশিষ্ট আর তার ছিল কপালজোড়া তুটি চোখ, নাক থাঁদা নয়, আর বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। পাঁচ বৎসর বয়সে যদি কেউ love-য়ে পড়ে, তাহলে আমি তার সঙ্গে love-য়ে পড়েছিলুম। অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার মনে হত মেয়েটির কি হল, কার

সঙ্গে বিয়ে হল। এই মেয়েটিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য একটি ছোট গল্পও পরে লিখেছি।

এই আমার যশোরের স্মৃতি।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

কৃষ্ণনগর

আজ লিখতে মন বসছে না। রবীন্দ্রনাথের কঠিন রোগের ভাবনায় আমার মন ভরে রয়েছে। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই আর ১৯৪০ খৃস্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল তাঁর ছায়াতেই মানুষ হয়েছি। পরশু রাত্তিরে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম। আমি যখন তাঁর ঘরে যাই তখন তিনি তন্দ্রাভিভূত, খাটে চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন। কি অসাধারণ সুন্দর পুরুষ। এ অবস্থাতেও তাঁর দেবদুর্লভ রূপ আমাকে চমকে দেয়। আমি ছেলেবেলা থেকেই রূপের ভক্ত। প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখি, তখন তাঁর অসামান্য রূপই আমাকে মুগ্ধ করে। আর সেদিন যা দেখলুম, তাতে মনে হল তিনি আরও সুন্দর হয়েছেন; আমি কৃষ্ণনগরেই আমাদের বাড়ীতে প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করি। সুতরাং কৃষ্ণনগর সম্বন্ধে আমার বাল্য-স্মৃতি আজ আর লেখা হবে না। আশা করি তিনি এ যাত্রায়ও আরোগ্য লাভ করবেন, কেন না তাঁর vitality-ও অসাধারণ। লোকোত্তর পুরুষের কথা বইয়ে ঢের পড়েছি, কিন্তু দেখেছি শুধু একটি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজ ১৯৪০ খৃস্টাব্দের দোসরা অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এ ফাঁড়া কাটিয়ে উঠবেন।

এখন বাল্যকালে ফিরে যাওয়া যাক্।

কৃষ্ণনগরে এসে আমি হঠাৎ জেগে উঠলুম—অর্থাৎ আমি চেতন পদার্থ হলুম। বোধ হয় ঠিকে গাড়ীর একদিন একরাত ঝাঁকুনিতে! যশোর থেকে বনগাঁ, বনগাঁ থেকে চাকদহ, বগুলা থেকে ন' মাইল দূরে কৃষ্ণনগরে একটা পুঁটলির মত ঠিকে গাড়ীতে আসতে হয়।

কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করামাত্র ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সব আমার নাক, কান, চোখের ভিতর দিয়ে ভিড় করে ঢুকতে লাগল; বাহ্যবস্তুর সঙ্গে আমার পরিচয় শুরু হল। আমি নানা বস্তুর রূপ দেখলুম আর তাদের নামও শিখলুম। দার্শনিকেরা যাকে বলেন নামরূপের জগৎ, সেই জগতের সঙ্গে আদান-প্রদানের কারবার আরম্ভ হল। এ জগৎ যে বিচিত্র, সে জ্ঞান আমার জন্মাল। যাঁরা বলেন মন নামক কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নেই, মন হচ্ছে দেহেরই বিকার, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, ঠিক কোন্ সময়ে এ বিকার শুরু হয় তা কি তাঁরা বলতে পারেন? আর এ বিকারের উদ্দেশ্যই বা কি?

কৃষ্ণনগরে আমি শৈশবে ও বাল্যকালে কি শিখেছি, তা বলতে গেলে পাঁচ বৎসর থেকে পনেরো বছরের হিসের দিতে হয়। যা শিখেছি তার বেশীর ভাগ unconsciously শিখেছি, আর কিছু consciously। সুতরাং আমি

consciously যা শিখেছি, তারই কথা প্রথমে উল্লেখ করব। এই শহরেই আমি ক, খ, শিখেছি ; a, b, c-ও শিখেছি।

কৃষ্ণনগরে এসে প্রথমে মিশনরি স্কুলে ভর্ত্তি হই। সে স্কুল বেশ বড় স্কুল ছিল, আর কেলাস হত সব বড় বড় ঘরে। কেলাসে কি শেখানো হত, তা মনে নেই। বোধ হয় প্রতি হপ্তায় একজন পাদরি এসে আমাদের খৃস্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিতেন। মাসখানেক পরে বাবা জিজ্ঞেস করলেন আমরা কি শিখেছি। আমি ও সেজদা আদম ও ইভের নাম করতেই তিনি মহা চটে বললেন—ওসব গাঁজাখুরি গল্প তোমাদের শিখতে হবে না! আর কিছু শিখেছ? আমরা বল্লুম—পাদরি সাহেবের কাছে একটি ভজন শিখেছি। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কি ভজন? আমরা দু'ভাই মিলে ভজনটি গাইলুম :

বন্যে এল ভেসে গেল, চাষার ডুবলো ধান,
শালাদের যেমন কর্ম্ম তেমনি শাস্তি দিলেন ভগবান।

এ ভজন শুনে বাবা চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন—তোমাদের স্কুলে আর যেতে হবে না। আর মাকে সম্বোধন করেও বললেন—কি কর্ম্ম? মা বললেন, চাষাদের কুকর্ম্ম এই যে, তারা খৃস্টান হয় নি।

এর পরই আমরা সে স্কুল ত্যাগ করলুম।

বাবা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। দেব-দ্বিজে তাঁর বিন্দুমাত্র ভক্তি ছিল না। আমাদের চৌধুরী পরিবারের

কেউই ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন না। যদিচ আমরা যাদব কীর্ত্তনীয়ার বংশধর ও শ্যামরায় হচ্ছেন আমাদের কুল-দেবতা, তবুও আমরা বৈষ্ণব নই। একে এই অভক্ত চৌধুরী পরিবারের ছেলে, তার উপর হিন্দু কলেজে শিক্ষিত, তাই বাবা সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। বিশেষত খৃস্টান ধর্ম্মের প্রতি তাঁর কোনরূপ অনুরাগ ছিল না। বরং বিরাগ ছিল। এর কারণ বোধ হয় অল্প বয়সে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। উক্ত ভদ্রলোক খৃস্টধর্ম্ম অবলম্বন করায় বাবা খৃস্টধর্ম্মকে ভয় করতেন। পূর্ব্বেই বলেছি তিনি কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ বলে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করতে সদাই উন্মুখ ছিলেন। পারিবারিক সংস্কারে তিনি এ বিষয়ে আবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং আমরা যে আদম ও ইভের রূপকথা শুনব, তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। এই সকল কারণে আমরা ছেলেবেলায় কোনও ধর্ম্মশিক্ষা পাই নি।

গুরুজনদের আদেশে আমি ও আমার সেজদাদা মাস-খানেকের মধ্যেই মিশনরি স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হলুম। অতঃপর আমরা ব্রজবাবুর স্কুলে ভর্ত্তি হলুম। সে স্কুল এখন A. V. School নামে পরিচিত।

এ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রজ মুখুজ্যে নামক নেদের পাড়ার জনৈক ভদ্রলোক। নেদের পাড়ার ভাল নাম হয়ত নদীয়ার পাড়া।

এ স্কুলে খৃস্টান কিম্বা অপর কোন ধর্ম্মের নামগন্ধ ছিল না। ব্রজবাবু ছিলেন ঘোর নাস্তিক। তাঁর স্কুলে ঈশ্বরের প্রবেশ নিষেধ ছিল, উপরন্তু তিনি ছিলেন ঘোর তার্কিক।

তাঁকে কেউ তর্কে এঁটে উঠতে পারতেন না; ফলে তাঁর সঙ্গে কেউ সদালাপ করতেও ভয় পেতেন। রাস্তায় তর্কের ভয়ে লোকে তাঁর পাশ কাটিয়ে চলত। আমি দূর থেকে তাঁকে দেখেছি—শরীর তাঁর ছিল কৃশ এবং আকার তাঁর ছিল দীর্ঘ। আর তাঁর চরিত্রও ছিল লাঠির মত কঠিন।

এ স্কুলে ঢুকে আমরা খুশি হইনি।

মিশনরি স্কুল ছিল প্রকাণ্ড হাতার ভিতর প্রকাণ্ড বাড়ী—পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

ব্রজবাবুর স্কুলে ছোট ছেলেদের ক্লাস হত একটা অন্ধকূপে। একটি এঁদো ঘরে আমরা পড়তে যেতুম। সে ঘরে আলো আসত না, বাতাসও না। তার উপর ঘরটি ছিল এত ছোট যে, ছাত্রদের সে ঘরে ব্ল্যাক হোল্-এর মত ঠাসা হত। সে স্কুলে কি পড়ানো হত আমার মনে নেই; বোধ হয় কিছুই হত না। শুধু শনিবারে একটি প্রকাণ্ড পুরোনো ছবির বই থেকে বাঘ-ভালুক প্রভৃতির ছবি দেখান হত।

সিংহ আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখেছিলুম—ছবিতে নয়, মাটির সিংহ প্রতিমার পায়ের নীচে। ভালুকের নৃত্যও দেখেছিলুম—দেখিনি শুধু বিদেশী জানোয়ার। জিরাফের কথা আজও মনে আছে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কি পড়ছ ?

আমরা বললুম—জানোয়ারের ছবি দেখছি।

বাবা বললেন—আমি স্কুল ভেবে তোমাদের দেখছি চিড়িয়াখানায় পাঠিয়েছি।

তার পর দিনই তিনি আমাদের সে-চিড়িয়াখানা হতে বার করলেন।

সেজদাদাকে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করা হলে আমার শিক্ষা একটা সমস্যা হয়ে পড়ল। আমাকে তখন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হল। কিন্তু সেখানে বেশী দিন থাকা হল না। ইতিমধ্যে যে সব বালকের সঙ্গে খেলার মাঠে পরিচিত হয়েছিলুম, তারা বিদ্রূপ করে বলতে লাগল—যাদের দশ হাত কাপড়েও কাছা নেই, তাদের সঙ্গে পড়া লজ্জার কথা। আমি বাবাকে বললুম—যাদের দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই, তাদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়ব না।

বাবা কথাটা শুনে প্রথমে হাসলেন, পরে বললেন—তোমার কথা ঠিক।

দ্বিতীয় বার co-education ঐখানেই শেষ হল।

তারপর আমার বিদ্যারম্ভ হল। মা বললেন—অবু তবু গিরিস্মৃতো, আর পুরুত কি বললে মনে নেই। তারপর বংশী মুচির জুতোর দোকানের পাঠশালায় তালপাতায় খাগড়ার কলম দিয়ে ভুসো কালিতে বড় বড় অক্ষরে ক খ লিখতে শিখি। কিন্তু বংশী মুচির পাঠশালায় বেশী দিন টিকতে পারি নি।

কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধে সেখান থেকে পালাতে হল। আমাদের বাসার কাছে Charity School নামে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল, তারপর সেই স্কুলে ভর্ত্তি হলুম। এ স্কুলে আমার বুদ্ধিবৃত্তি খুলে গেল এবং সত্য কথা বলতে যথার্থ লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলুম। এ স্কুলে হেড মাস্টার ছিলেন একজন 'কুরি'—যাকে আমরা বলি ময়রা। লোকটি ছিলেন প্রকাণ্ড পুরুষ, অতি ভদ্র, অতি সহৃদয় ও রাশভারী লোক। ছেলেদের তিনি মারধর করতেন না, তা হলেও আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতুম। এ স্কুলে আমি প্রায় তিন বৎসর পড়ি। আর সেখানেই আমি সমগ্র পাটীগণিত, বাংলার ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত—অবশ্য আংশিকভাবে—শিখি। আর শিখি শিকলের জরিপ আর কালি করতে। শেষটা বড় দাদা আমাকে সে স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। আমাদের বাড়ীতে জনৈক ভদ্রমহিলা মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, মেমের সাজপোষাক পরা ও কষে কর্‌সেট আঁটা। তিনি চলে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম যে,—কৃশাঙ্গীটি কে? দাদা বল্‌লেন যে, ছোক্‌রা যথেষ্ট বাঙলা শিখেছে, আর বেশী শিখতে হবে না। পরের দিনই ছাত্রবৃত্তি স্কুল থেকে আমার নাম কাটানো হল। তারপর কোন্ স্কুলে যাব তা স্থির করতে করতে কিছু দিন গেল। সেকালে কৃষ্ণনগরে দেবনাথ মাস্টার নামে একটি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি যে কোন্ স্কুলের মাস্টার ছিলেন, তা কারও

জানা ছিল না। ছিরু মাস্টার বলে একজন ছিলেন, তিনি খালি পায়ে খালি গায়ে শীত গ্রীষ্ম একখানি র‍্যাপার পিঠে ফেলে ভিক্ষে করে বেড়াতেন। তিনি কারো বাড়ী এসে প্রথমেই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম রামতনু বাবুর কেচ্ছা কাটতেন, তারপর সিকেটা আধুলিটা চাইতেন, এবং তা পেতেন। সুখের বিষয়, তাঁর কোন স্কুল ছিল না।

দেবনাথ মাস্টার বেশভূষায় চরিত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত লোক ছিলেন। তিনি সদাসর্ব্বদা মাস্টার মশায় সেজে বেড়াতেন। পায়ে এক জোড়া তালিমারা জুতো, পরনে পেণ্টলুন, গায়ে একটি ছাতার কাপড়ের চাপকান—বয়েসে যার রং হয়েছে হলদে—ও মাথায় একটি টুপি। তিনি বলতেন যে, তাঁর তুল্য শিক্ষক আর নেই। তিনি একটি নতুন স্কুল খুলবেন এবং সেই স্কুলে আমাকে ভর্ত্তি করতে হবে বলে বাবাকে ধর-পাকড় করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাতে রাজি হলুম না। না হবার কারণ, স্কুল বাড়ীটি ছিল জঘন্য। সেদিন শুনলুম দেবনাথ মাস্টারের স্কুল আজও টিকে আছে এবং হাই স্কুল হয়েছে। এ পরিণতি যে কি করে হল বুঝতে পারিনে। দেবনাথ মাস্টার হয়ত পয়লা নম্বরের শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে যে কোনও কালে কিছু শিক্ষা করেছেন, তার প্রমাণ আমরা পাইনি। সংস্কৃতে আছে যে, উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মী লাভ করে। যদিচ চেহারায় মাস্টার মশায় সিংহ ছিলেন না, ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ অস্থিচর্ম্মসার একটি ব্যক্তি।

সে যাই হোক, আমি কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হই এবং তেরো বৎসর পর্য্যন্ত পড়ি। এনট্রেন্স পরীক্ষা দিতে যাব, এমন সময় ঘোর ব্যারামে পড়ি; আর কিছুদিন বাবার কাছে আরায় থেকে পরে কলিকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হই। সেই বয়েস থেকেই আমি কলিকাতাবাসী হই। কৃষ্ণনগরে কলেজের স্কুলের বিষয় বেশি কিছু বক্তব্য নেই। নীচু ক্লাসের মাস্টারেরা ছিলেন কুমোর ও গাঁড়াল।

এই জাতীয় শিক্ষকদের চেহারা আজও মনে আছে। পঞ্চানন পাল ছিলেন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ—আর তাঁর মুখটি ছিল বাটালি দিয়ে নয়, কুড়ুল দিয়ে কাটা: এমন বিশাল চোখ আজ পর্য্যন্ত আর কোন মানুষের মুখে দেখিনি। আর নাকটি ছিল তদ্রূপ।

লাস্ট ক্লাসের গিরিশ পণ্ডিত আমাদের নীতি উপদেশ দিতেন। তাঁর একটি উপদেশ আমার আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন যে, মাছমাংস কখনো খেয়ো না, যেমন আমি খাইনে। তবে মাছের ও মাংসের ঝোল খেয়ো যেমন আমি খাই; আর ঝোলের সঙ্গে যদি দু-এক টুক্‌রো মাছ কি মাংস আসে, তা খেতে পারো। যো আপসে আতা উস্‌কো আনে দেও—এই বলে! বাবা এই উপদেশের কথা শুনে আমায় ফারসি পড়তে আদেশ করলেন। আমি আলেফ বে পড়তে আরম্ভ করলুম। মৌলবি সাহেব ছিলেন অতি সুপুরুষ আর

তাঁর বেশভূষা ছিল সুন্দর—উপরন্তু তিনি ছিলেন অতি ভদ্র। কেন ফার্সি পড়া ছেড়ে দিলুম, তা পরে বলব।

সে স্কুলের মাস্টার মশায়রা কেউ কেউ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন, সিক্সথ্ ক্লাস-এর মাস্টার অটল মৈত্র ও থার্ড ক্লাসের মাস্টার পূর্ণ মিত্র। আমি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে যা শিখে-ছিলুম, কলেজিয়েট স্কুলে তার বেশী কিছু শিখিনি। পাটীগণিত, ভূগোল, বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস শিখে এসেছিলুম। তাতেই এন্ট্রেন্স পর্য্যন্ত কুলিয়ে গিয়েছিল। নতুনের মধ্যে শুধু শিখেছিলুম ইংরেজী, সংস্কৃত, জ্যামিতি ও বীজগণিত। ইংরেজী অবশ্য স্কুলে শিখিনি, শিখেছিলুম আমার সেজদার কাছে। তিনি আমাকে বুঝি আর না বুঝি স্কটের উপন্যাসগুলি পড়তে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বই পড়তে পড়তে আমি ইংরেজী শিখি; আর আমাদের সহপাঠীদের তুলনায় ভালই শিখি। আর সংস্কৃত শিখি পরীক্ষা পাস করবার মত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখি। স্কুলে যে পণ্ডিত মশায় ছিলেন তিনি যেমন ভাল-মানুষ, তেমনি নির্ব্বোধ। তাঁর কাছে কিছু শিখিনি, কেন না তিনি কিছুই শেখাতে পারতেন না। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি যে, জনৈক ব্রাহ্মণ কোনও পণ্ডিতকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্তর্কালঙ্কার মশায়, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর করেন, স্তিলের স্তৈল মেখে স্ত্রিবেণীর ঘাটে স্তান করতে যাচ্ছি! আমাদের পণ্ডিত মশায়ের সংস্কৃত উচ্চারণ ছিল তদ্রূপ।

আমি স্কুলে কি শিখেছি, সেই কথাই বলছিলুম। সোজা কথা এই যে, বিশেষ কিছু শিখিনি। সেকালে শিক্ষার পদ্ধতি তেমন বাঁধাধরা ছিল না। এবং নীচু ক্লাসের মাস্টার মশায়রাও তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। তবে তাঁরা আমাদের গায়ে হাত দিতেন না। এক কথায়, সেকালে শিক্ষার অত্যাচার ছিল না।

স্কুলে আমরা ক, খ, শিখি আর অনেক জিনিস শিখি unconsciously।

কৃষ্ণনগর ছিল পাড়াগেঁয়ে শহর—অর্থাৎ অর্দ্ধেক শহর, অর্দ্ধেক পাড়াগাঁ। সেখানে অনেক কামার, কুমোর, ছুতোর, স্যাকরা, কলু প্রভৃতি বাস করত, আর তাদের দোকানে আমাদের গতিবিধি ছিল অবাধ। এমন কি, গুলির আড্ডায়ও দু-একবার গিয়েছি। শুঁড়ির দোকানেও। গুলি খেত ছোটলোকেরা, আর মদ খেত আধা-ভদ্রলোকে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বাঙ্গাল; জমিদারীর আমলা যারা, মোকদ্দমার তদ্বির করতে কৃষ্ণনগরে আসত। কিন্তু শুঁড়িরা মদ খেত না—অন্তত দোকানে নয়।

আমাদের ছেলেবয়সে ঘুড়ি ওড়াবার সখ ছিল. সুতরাং কাকে লাট খাওয়া বলে, কাকে কান্নি মারা বলে, কাকে গোত্তা মারা বলে, তাও আমরা শিখেছিলুম এবং তাদের সূতোর গুণ কি, রিলের সুতোর বা ফেটির সূতোরই বা গুণ কি, তাও আমরা শিখেছিলুম। ফেটির সূতো হচ্ছে দেশী সূতো। চাষারা ও-সূতো উরতের উপর পাক দিতো। খরমাঞ্জা ধরে

নাকি ফেটির সুতোরই উপর ভাল। ঘুড়ি অবশ্য নিম্নশ্রেণীর ছোকরাও ওড়াত। এই সূত্রে সব জাতের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল।

কৃষ্ণনগর কলেজের উত্তরে মালোপাড়া বলে একটি পাড়া ছিল। সেখানে বাস করত যারা মাছ ধরে, নৌকো বায়। তারা ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। আর তাদের কাছেই শিখেছি, নৌকোর কোন্ অংশকে গলুই বলে; কাকে পাটাতন বলে, আর কাকে হাল বলে, পাল বলে, কাকে লগি মারা বলে, কাকে গুণ টানা বলে। আর তা ছাড়া নৌকোয় কাঠ জুড়তে হয় গাবের আঠা দিয়ে। এদের নৌকোয় আমি একবার কৃষ্ণনগর থেকে পলাশী গিয়েছি, দু'বার হুগলী পর্য্যন্ত। ঝড়ঝাপ্টা উঠলে আমাদের নৌকো থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে হত, আর মাঝি নোঙ্গর ফেলত।

এর থেকে সহজেই বুঝা যাবে যে, বাঙ্গলা ভাষা আমি একমাত্র বই পড়ে শিখিনি। শিখেছি নানাশ্রেণীর নানা লোকের মুখে শুনে; যেমন সকলেই শেখেন। কিন্তু এ সব কথা আজ পর্য্যন্ত আমাদের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় নি; বোধোদয়েও নয়, কথামালাতেও নয়, সীতার বনবাসে ত নয়-ই। আমি এ-জাতীয় শব্দ আবশ্যক হলে আমার লেখায় ব্যবহার করি। ফলে আমার সাহিত্যিক ভাষারও পুঁজি বেড়ে গিয়েছে। আমি কৈশোরে ফরাসী ভাষাও কিঞ্চিৎ আয়ত্ত করি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ও-ভাষার বই সহজে

পড়তে পারিনে, কারিগরদের নিত্যব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে পরিচিত নই বলে। এ ছাড়া বহু গাছপালা ও সাপের নাম শিখি। সে সব নাম চলতি ভাষাতেই পাওয়া যায়। অবশ্য এ সব কথার প্রদেশবিশেষে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। কারিগরদের যন্ত্রপাতির নাম শুধু কানে শুনে শেখা যায় না, তাদের চোখে দেখেও শিখতে হয়; গাছপালারও তাই, পাখী ও জানোয়ারদেরও তাই। নামের সঙ্গে রূপের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে এ সব কথা আয়ত্ত করতে হয় না। তা ছাড়া, সেকালে নদে শান্তিপুরের মৌখিক কথাও খুব শ্রুতিমধুর ছিল। আমাদের বিশ্বাস ছিল, সেই ভাষাই—কি উচ্চারণ, কি অর্থব্যক্তিতে—বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ভাষা। সে ভাষার তুলনায়—কি পূর্ব্ববঙ্গের, কি কলকাতার ভাষা ঈষৎ শ্রুতিকটু লাগত। তাই আমার ভাষার বনেদ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনাগরিক ভাষা। ইতিমধ্যে আমার মুখের কথা যদি কিছু বদ্‌লে গিয়ে থাকে ত সে কলকাতার মৌখিক ভাষার প্রভাবে নয়। আমি এখন সাহিত্যিক বলে গণ্য। তাই আমার বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার কথা বলছি। আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর। সেই ভাষাই আমার মূল পুঁজি, তারপর তা সুদে বেড়ে গিয়েছে। বাঙ্গলা বই ছেলেবেলায় অনেক পড়েছি, কিন্তু বইয়ের ভাষা আমার কস্মিনকালেও আদর্শ ছিল না। অবশ্য কে কোথা থেকে ভাষা সংগ্রহ করেছেন বলা শক্ত, কিন্তু মোটামুটি ভাবে বলা যায়, তাই বলতে চেষ্টা করলুম। ভাষা

ব্যবহার করতে selection-এর প্রয়োজন—আর এই selection হয় লেখকের স্বীয় রুচি অনুসারে।

আমি সেকালের কৃষ্ণনগরের কথা বড় বেশী করে বলছি। তার কারণ এই যে, আমাদের বিশ্বাস ছিল তার তুল্য ভাষা বাঙ্গলায় আর কোথাও নেই।

যার গলার সুর আছে সে গান করতে বসলে তার সুর যেমন আপনা হতেই বাঁকে-চোরে আর ঘোরে; তেমনি যার মুখের ভাষা ভাল, সেও সে ভাষাকে ইচ্ছা করলে বাঁকাতে ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণনাগরিকরা জানতেন, এরই নাম বাকচাতুরী। ভাষা শুধু কাজের ভাষা নয়, লেখারও ভাষা। ফরাসীরা যাকে *jeu de mots* বলে, সে খেলার চর্চ্চা সে শহরেও করা হত। এর ফলে আমার লেখার ভিতর যদি বাক্‌চাতুরী থাকে ত তার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী। অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। সেকালে যারা ছোক্‌রা ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন,—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর আমি। আমরা দু'জনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দু'জনেরই লেখায় আর যে গুণের অভাব থাক্—রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম হাসির গান আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুধু লোককে হাসাবার জন্য লেখা হয় নি। এর মধ্যে অনেকগুলি গান মারাত্মক বিদ্রূপে

পরিপূর্ণ। চিনির মোড়কে যেমন কুইনিনের বড়ি খাওয়ান হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনি হাসির মোড়কে মেকি পেট্রিয়টিসম্, ঝুঁটো ধর্ম্ম ও নানাপ্রকার সামাজিক মিথ্যাচারের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করেছেন। বীরবলও তেমনি লোকের অন্তরে মিছরির ছুরি ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

এর কারণ, আমার ছেলেবেলায় কৃষ্ণনাগরিকরা পঞ্জিকা-শাসিত ছিলেন না; যেমন আজও অনেক শিক্ষিত লোক আছেন। তাঁদের মধ্যে ধর্ম্মের গোঁড়ামি ছিল না। অধিকাংশ লোক এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। যদিচ কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের পাশের নগর, তবুও সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোনও ভক্তকে আমি দেখিনি। কৃষ্ণনাগরিকরা ব্রাহ্ম ছিলেন না, দু'-একজন ছাড়া। সুতরাং কোনও ধর্ম্মের গোঁড়ামি আমাদের কান মন স্পর্শ করে নি। সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত থেকে আমরা মুক্ত ছিলুম। এর ফলে মানসিক খোলা হাওয়ায় আমরা বাস করতুম। সব জিনিস হেসে উড়িয়ে দেওয়া তাদের স্বাভাবিক ছিল। ঠাট্টা জিনিসটেরই তারা চর্চ্চা করত।

ভাষা আমরা একমাত্র লোকের মুখে শিখিনে, বই পড়েই শিখি। কৃষ্ণনগরে বাসকালে আমি কি কি বই পড়েছিলুম, তা বলছি। আমি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে কাশীদাসের মহাভারতের কতক অংশ, আর হয়ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস পড়ি। কৃষ্ণচন্দ্রের বাঙ্গলার ইতিহাস ও তারিণীচরণের

ভারতবর্ষের ইতিহাস—এই দু'খানি বই আমার স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান দেয়। সেকালে আমার মনে হত, বই দু'খানি ভাল ও সুখপাঠ্য। আমাদের বাড়ীতে বাঙ্গলা বইও খানকতক ছিল। বঙ্গদর্শন বাঁধানো ছিল। আর সেই বাঁধানো বঙ্গদর্শন থেকে আমি বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ আর বোধ হয় কপালকুণ্ডলা পড়ি। দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য আর নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধও পড়ি। নীলদর্পণ আমি পড়িনি, কিন্তু তার অভিনয় দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠি। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান আমাদের খুব প্রিয় কাব্য ছিল। আর এ ছাড়া শিশির ঘোষের নওশ' রূপেয়া।

বাবা বাঙ্গলা বই পড়তেন না, কেন না তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি দেদার বই পড়তেন, কিন্তু সে-সবই ইংরেজী বই। তবে এ সব বই এলো কোত্থেকে?—বাবা যখন যশোরে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন দীনবন্ধু মিত্র সে শহরে পোস্ট আফিসে কোন বড় চাকরি করতেন, নবীন সেনও ছোক্‌রা ডেপুটী ছিলেন, আর আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমের ভাই সঞ্জীবও ছিলেন ডেপুটী; আর শিশির ঘোষ ত যশোরের লোক।

সে যাই হোক্—অল্প বয়সেই আমি কালী সিংহের মহাভারত পড়েছি, আর পড়েছি হরিদাসের গুপ্ত কথা। এ বই অবশ্য বালকের পাঠ্য নয়, কিন্তু তার ভাষা সাধুভাষা নয়, আর

অতিশয় চটকদার। সে বইয়ের প্রথম পাতা পড়ে দেখবেন—লেখা কি চমৎকার। অবশ্য আরব্য উপন্যাস বাঙ্গলায় পড়েছি আর পারস্য উপন্যাস, রবিনসন ক্রুশো ও রাসেলাস্। হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর একটি কবিতা "ভারত সঙ্গীত" আমাদের সেকালে মুখস্থ ছিল। সেকালে বাঙ্গালীর মনে পেট্রিয়টিসমের জোয়ার এসেছিল—আর আমরা ছোট ছেলেরা সে জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলুম।

আমাদের বাড়ীতে ইংরেজী সাহিত্যের চর্চ্চা ছিল। বাবার পড়ার ঝোঁক বোধ হয় উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা লাভ করি।

আমার বড়দাদা ইংরেজী ভাষা খুব ভাল জানতেন; আর আমার সেজদাদা কুমুদনাথ অল্প বয়েস থেকেই ছিলেন শিকারী। তিনি শিকারের বই পেলেই পড়তেন। শেষ বয়সে তিনি শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তিনিই আমাকে ইংরেজী নভেল পড়তে শেখান, এ কথা পূর্ব্বে বলেছি।

আমাদের ইংরেজী সাহিত্যচর্চ্চার সুযোগ ছিল। বাবার একটি ইংরেজী বইয়ের প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল। মা'র মুখে শুনেছি, বাবা হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করে ফেরবার সময় এক দিনে এই লাইব্রেরী কেনেন। এ লাইব্রেরীতে ছিল অনেক ইতিহাসের বই, ও প্রতি ঐতিহাসিকের সমগ্র বই। কারও বই সাত আট ভল্যুমের কম নয়। আর ছিল স্কট-এর সমস্ত বই। দশ-বারো ভল্যুম শেক্সপীয়ারের, মিল্টন-এর সমস্ত

কাব্য, বায়রন-এরও তাই। বলা বাহুল্য এ সব বই আমরা স্পর্শও করিনি। মধ্যে মধ্যে স্কট-এর দু-একটি নভেল পড়েছি। এই লাইব্রেরীর প্রসাদে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি বহু ইংরেজী বই-এর নাম জানতুম। এর ফলে দাদার, সেজদার, আমার ও আমার ছোট ভাই অমিয়র বই কেনা বাতিক হয়।

পরে আমরা প্রত্যেকেই এক একটি লাইব্রেরী সংগ্রহ করি। সব চাইতে বড় লাইব্রেরী ছিল দাদার, তারপর আমার, তারপর সেজদার ও অমিয়র। বাবার লাইব্রেরী ও দাদার লাইব্রেরী এখন কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমার ফরাসী লাইব্রেরীও সেখানে, এবং আমার ইংরেজী বই শান্তিনিকেতনে। আর শ পাঁচেক বই আমার কাছে আছে।

বই কিনলেই যে পণ্ডিত হয়, তা অবশ্য নয়। তবুও এ সব কথা বলছি এই জন্য যে, লাইব্রেরী করার সখ এখন আর লোকের নেই। তার একটি কারণ, লাইব্রেরী থাকলে পুরোনো কাগজের দামে বিক্রী হয়।

কলকাতা শহরে দেখেছি কোন কোনও বাড়ীতে বড় লাইব্রেরী ছিল; এখন নেই।

আমি জানি সুবোধ মল্লিকের কাকা হেমন্ত মল্লিকের বাড়ীতে একটি নাতিহ্রস্ব লাইব্রেরী ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেদার বই কিনতেন, কিন্তু লাইব্রেরী গড়েন নি। গগনেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল। এবং

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের একটি চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। তাঁর সংগৃহীত ফরাসী বই আমি কিনি। কিন্তু তাঁর ইংরেজী বইয়ের কি হল জানিনে। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল।

এ সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা কৈশোরে লাইব্রেরীর আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। এখন লাইব্রেরী হয়েছে সকলের জন্য,—ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়।

আমি ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ ইংরেজীও শিখেছিলুম। মাস্টার মহাশয়ের পড়ানোর গুণে নয়—নিজে পড়েই। আমি ছাত্রবৃত্তি স্কুলপড়া ছেলে,—ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ আমার মোটেই ভাল ছিল না। বার্ড ওয়ার্ড প্রভৃতি শব্দ আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারতুম না, আর দাদারা আমার এই অক্ষমতার দরুণ আমাকে ঠাট্টা করতেন। আমার বয়েস যখন নয়, তখন সেজদাদা আমার ইংরেজী শিক্ষার ভার নিলেন। আমাদের অবশ্য জনৈক গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন আমাকে a, b, c, d, শেখান, তখন তিনি ফার্স্ট কেলাসে পড়তেন; আর আমি যখন এনট্রান্স্ কেলাসে উঠি তখনও তিনি সেই কেলাসেই পড়তেন। তিনি এনট্রান্স্ কেলাসে শিকড় গেড়েছিলেন। ইংরেজী ভাষার অক্ষমতাই তাঁর ল্যাগাড় ফেলের কারণ। তাঁর কাছে একটি অমূল্য উপদেশ পেয়েছি। তিনি উঠতে বসতে বলতেন, "হরি হে ত্রাণ করো, যার ধারি তার স্মরণ করো।" তাঁর গুরুভক্তির আর একটি প্রমাণ—তিনি

আমাদের শিখিয়েছিলেন—"গুরু! টেনে ধরো চোখের ভুরু।" ইনি ঢুকেছিলেন আমাদের গৃহশিক্ষক হয়ে, শেষটা হয়েছিলেন আমাদের বাজার-সরকার।

আমাদের ছেলেবেলায় আর্ট কথাটা বাঙলা ভাষায় ঢোকে নি। ইংরেজীতে যাদের আর্টিস্ট বলি, আমরা তাদের কারিগর বলেই জানতাম। আমার বিশ্বাস, এই কারিগরদের দল থেকেই আর্টিস্ট উদ্ভূত হয়েছে। যেমন ইতালী দেশে হয়েছিল। আমরা সে দেশের যে সকল লোককে বড় আর্টিস্ট বলে মানি, তারা প্রথমে ছিল কারিগর মাত্র।

সে যাই হোক, কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা ছিল যথার্থ আর্টিস্ট। তাদের মত প্রতিমা গড়তে অন্য প্রদেশের কুমোরেরা পারত না। সুন্দর প্রতিমা গড়া ত বড় শিল্পীর কাজ। কিন্তু কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা কেউ শিব গড়তে বাঁদর গড়ত না। আমি তাদের হাতের চমৎকার আহ্লাদী পুতুল দেখেছি, যার দাম দু'পয়সা। ওর ভিতর এমন গড়নের কৌশল আছে, যা দেখে হাসি পায়। মুখব্যাদান করে এ পুতুল লোককে হাসায় না, হাসায় তার গড়নের গুণে। আজকাল শিশুপাঠ্য বইয়ের ছবিগুলি প্রায়ই ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর রস যে হাস্যরস নয়, সে জ্ঞান কৃষ্ণনগরের পুতুল-নির্ম্মাতাদের ছিল।

কৃষ্ণনগরের কুমোরদের মত বাঙ্গলায় অপর কেউই ক্লে-মডেলিং-এ ওস্তাদ ছিল না।

আমার ছেলেবেলায় যদু পাল নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে

পাবলিক লাইব্রেরী

সব চেয়ে বড় কারিগর ছিলেন, তাঁকে নির্ভয়ে আর্টিস্ট বলা যায়।

দাদা তাঁর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েন—এবং দাদার অনুরোধে তিনি বিলেতি বইয়ের ছবি দেখে ভিনাস গড়তেন। আমাদের বাড়ীতে তাঁর রচিত ছোট ছোট দুটি-তিনটি ভিনাস ছিল; আমার সেকালে মনে হত যে তারা বিলেতি ভিনাসের অনুরূপ। তার একটিও আজ নেই, কারণ পাথরে নয়, মাটিতে তাদের গড়া হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের মাটি এঁটেল হলেও পাথরের মত বহুকাল স্থায়ী নয়। সে মাটি গুণীর হাতে পড়লে নানা বস্তুর রূপ নেয়, কিন্তু সে সব বস্তুর ধর্ম্ম নিতে পারে না। এই যদু পালের বংশধরেরা এখনও গুণী বলে পরিচিত।

মাটির মূর্ত্তি প্রথমে গড়ে পরে সেটিকে পাথরে নকল করার নাম ভাস্কর্য্য।

কৃষ্ণনগরে স্থাপত্যেরও সাক্ষাৎ পাই,—আর্কিটেক্‌চার। রাজবাড়ীর চকফটক অতি সুন্দর আর রাজবাড়ীর পূজোর দালান ও নাটমন্দির চমৎকার। এ কটিই মুসলমান স্থাপত্যের সুন্দর লক্ষণ। এর তুল্য পূজোর দালান ও নাটমন্দির আমি অন্য কোথাও দেখি নি। নদীয়া জেলায় ইংরেজ আমলে গড়া দু-একটি প্রকাণ্ড ইমারৎ দেখেছি, কিন্তু তাতে চোখ-ভোলান সৌন্দর্য্য নেই।

কৃষ্ণনগরে রাজবাড়ীর এ সব ইমারৎ কারা গড়েছে জানিনে,

তবে এ যে মুসলমান স্থাপত্যের নমুনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নীচে মোটা ও উপরে সরু থামের উপরে টানা খিলেন যেমন সুদৃঢ় তেমনি সুদৃশ্য। আমাদের হরিপুরের বাড়ীর মণ্ডপের সুমুখে বারান্দায় এই রকম থাম ও খিলান ছিল; এখন নেই, দাদারা তা ভেঙ্গে ফেলেছেন, বোধ হয় খিলেন-গুলো ভেঙ্গে পড়বে ভয়ে। কোথায় কৃষ্ণনগর আর কোথায় হরিপুর। এই দুই জায়গায়ই যে একই নমুনার থাম ও খিলেন ছিল তার থেকে অনুমান করছি দুই-ই মুসলমান স্থাপত্য। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, কলেজিয়েট স্কুলে একটি গাঁড়াল মাস্টার ছিলেন। শুনেছি যে-কেউ সেকালে ইমারৎ গড়ত, তারাই গাঁড়াল বলে পরিচিত।

এর থেকে অনুমান করছি যে, সেকালে ভাস্কর্য্য স্থাপত্যের চর্চ্চা হিন্দুরাই করত। ইংরেজ আমলে সব উল্টে পাল্টে গিয়েছে। আর্ট-জিনিসটা এখন আমাদের ওষ্ঠাগত—করায়ত্ত নয়।

ছবি আঁকিয়ে লোক আমি সে শহরে দেখিনি। দুটি একটি পোটো অবশ্য আমি দেখেছি। কিন্তু কোন হিসাবেই তাদের চিত্রকর বলা যায় না।

তারা দেয়াল রং করতে পারত, ও লতাপাতা আঁকতে পারত। বোধ হয় সেকালে ছবির কোন চাহিদা ছিল না।

কিন্তু ফণী সেন বলে কৃষ্ণনগরে একটি যুবক ছিলেন। তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্র। তিনি এবং আরও

তিন-চার জন আর্ট স্কুলের ছোকরা মিলে সরস্বতী, চৈতন্য প্রভৃতির ছবি এঁকে আর ছাপিয়ে বাঙলা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে রকম ছাপানো ছবি আমি বহু লোকের ঘরে দেখেছি। এঁদের পন্থা অনুসরণ করেই রবি বর্ম্মা তাঁর সব ছবি আঁকেন এবং কতকটা প্রসিদ্ধিও লাভ করেছিলেন।

চিত্রকর সব আজকাল প্রাদুর্ভূত হয়েছেন এবং তাঁদের নব নব উন্মেষশালী বিচিত্র চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার শক্তি তাঁদের করায়ত্ত নয়।

যদিচ আমরা যাদবানন্দ কীর্ত্তনিয়ার বংশধর, আমাদের গ্রামের নাম হরিপুর, আর আমাদের কুলদেবতা শ্যামরায়, তথাপি আমাদের পরিবার বৈষ্ণবও নয়, কীর্ত্তন-বিলাসীও নয়। শুধু কীর্ত্তন কেন, কোনরূপ সঙ্গীতের চর্চ্চা চৌধুরীকুলে কস্মিনকালেও ছিল না।

বাবা ছিলেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, যশোরে মুখুজ্যে মহাশয় নামক জনৈক অজ্ঞাতকুলশীল ভদ্রলোক আমাদের বাড়ীতে থাকতেন ও সেতার বাজাতেন। তিনি কারুর সেতারের মাস্টার ছিলেন না। উক্ত ভদ্রলোকের চেহারা আমার আজও মনে আছে। তাঁর দাড়ি ছিল পাকা ও লম্বা, আর তাঁর দেহ ছিল কৃশ,—না-লম্বা, না-বেঁটে।

আমি কৃষ্ণনগরে এসে মায়ের কাছে মুখুজ্যে মহাশয়ের দু-চারটি সেতারের বোল শুনেছি। আমার মাতুল পরিবারে

সঙ্গীতের চর্চ্চা ছিল, তাই আমার মায়ের গানের গলাও ছিল,—কানও ছিল। তাঁর কাছ থেকেই আমি সঙ্গীত-প্রিয়তা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। আমি যে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে বাচালতা করি, তার কারণও সঙ্গীতের প্রতি আমার আবাল্য অনুরাগ।

ছেলেবেলায় আমার এই সেতারের বোল এত ভাল লাগত যে, আজও তা মনে আছে। একটি হচ্ছে এই :

শান্তিপুরের খালের ভিতর জাহাজ ডুবেছে
বজরা ভেসে উঠেছে,
সাহেব বলে, তোবা তোবা,
বিবি বলে জান গেল!
আর একটা পাখী বলে
চোখ গেল।

দ্বিতীয়টির প্রথম ছত্র মনে আছে :

বৌ কথা কও পাখী ছিল ডালেতে বসে
তাদের মারলি কি দোষে!

সেতারের বোল শুধু দাদেরে দেরে নয়—গানও হয়।

আমি পরে একটি বেহাগের হিন্দী গান শুনি, সেটি অবিকল সেতারের গৎ থেকে গানে রূপান্তর করা হয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের পরিবারে কেউ গাইয়ে বাজিয়ে ছিলেন না। অল্প-স্বল্প যা গান গাইতে পারতেন আমার মা। তিনি অন্যের মুখে শুনে দু-চারটি গান

শিখেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মৃদু অথচ মোলায়েম। তাঁর একটি গানের কথা আজও মনে আছে ঃ

অয়ি সুখময়ী উষে
কে তোমারে নিরমিল
(ললিত)

আর সেকালে ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রথম যুগে প্রকাশিত দু-চারটি গান শুনেছি, কার মুখে তা মনে নেই, তার কতকগুলি যেন আজও মনে আছে।

১। গাও হে তাঁহার নাম। (খাম্বাজ)
২। দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে। (বাহার)
৩। দিবা অবসান হল। (পূরবী)

এই শেষ গানটি শুনে আমার মন মুষড়ে গিয়েছিল,—শুধু ওর ভাষার জন্য নয়, সুরের জন্যও। পূরবী শুনলে আজও আমার মন দমে যায়। তারপর একটি যুবকের মুখে পিলু-রাগিণীর একটি গান শুনে আমার কানে অতি চমৎকার লাগল। তারপর পিলুর অনেক গান আরও দু-চার জনের মুখে শুনি।

তার পর দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্ত্তিক দেঁওয়ানের মুখে অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন অতি সুকণ্ঠ ও সঙ্গীত বিদ্যায় সুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাঙ্গলা হিন্দী দু-ভাষারই গান গাইতেন কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই।

দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভা-সমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধ হয় কণ্ঠসঙ্গীত তাঁর পিতার কাছেই শিক্ষা করেছিলেন। আরও দু-চারজনের মুখে অতি মিষ্টি গান শুনেছি, তাঁদের নামও মনে আছে।

এসব গানই গাওয়া হত ওস্তাদী ঢংয়ে, ওস্তাদদের তাল-কর্ত্তব বাদ দিয়ে। সেকালের বাঙ্গলা গানকে হিন্দী গানের অপভ্রংশ বলা যেতে পারে। একেবারে তান বাদ দিয়ে ঝিঁঝিট-খাম্বাজ গাওয়া যায় না, তাই ও-জাতীয় গান গাইতে হলে গলাকে একটু খেলাতে হয়, যা বেহাগ বাগেশ্রীতে করতে হয় না। ফলে বাল্যকালে আমার কান তৈরী হয়েছিল বাঙ্গলায় যাকে বলে ওস্তাদী ঢংয়ের গানে। আজ পর্য্যন্ত আমার কানের সে অভ্যাস যায়নি। আমার কান সহজেই মার্গসঙ্গীতের অনুকূল।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের গা-ঘেঁষা শহর হলেও, এ শহরে কীর্ত্তনের রেওয়াজ ছিল না। বোষ্টম বৈরাগী সর্ব্বত্রই আছে, কৃষ্ণনগরেও ছিল। এই ভিক্ষাজীবী বৈরাগীদের মুখে দু-চারটি কীর্ত্তন শুনেছি। তার দু-একটি গানের সুর আজও মনে আছে। যথা: "নদীয়ার বৈরাগীর রাজা শ্রীচৈতন্য গৌরহরি" আর "হরি নাম বিনে কি বল আছে সংসারে, বল্ রে মাধাই মধুর স্বরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা নেড়ানেড়ীর গজল পুরো মনে আছে, সেটা হচ্ছে এই:

"যদি গৌর চাস্
কাঁথা নে ধনী।
সকাল বেলা ভিক্ষেয় যাবি
ঘরে এসে তেল মাখাবি,
আর পেতে দিবি বিছানাখানি।
আর গাঁজার কল্‌কেয় আগুন দিবি দিবস রজনী।

এ গান শুনে আমাদের খুব মজা লাগত কিন্তু ভক্তি বেড়ে যেত না। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় কীর্ত্তন আমাদের মনে কোন ছাপ রেখে যায় নি, আর কীর্ত্তন শেখবার লোভ আমাদের জন্মায়নি। আর নেড়ীর এই গান: "এ-পূজোতে ঝুমকো দিবি তবে ঘরে রইব" ইত্যাদি উপরোক্ত নেড়ার গানের সনাতন উত্তর। পুরুষ চায় সেবাদাসী, স্ত্রী চায় অলঙ্কার।

গান গাইবার প্রবৃত্তি অনেকের আছে, কিন্তু শক্তি সকলের নেই। আমার দাদাও গান গাইতে চেষ্টা করতেন। তাঁর একটি গানের প্রথম ছত্র আজও মনে আছে: "ওপাড়াতে দুধ জোগাতে যাইগো আমার বেলা হল।" এরি নাম কি মার্গ-সঙ্গীত? আমাকে জনৈক মারহাট্টি ওস্তাদ বলেছিলেন, যে, "বাৎতো আচ্ছা লাগতি, গানেকা কেয়া জরুরৎ হ্যায়?"

দাদার গান সম্বন্ধে ঐ একই প্রশ্ন করা যায়। আমার মেজদাদা কখনও এইরূপ বৃথা চেষ্টা করেন নি। আমার সেজদাদা কুমুদনাথ ছবি আঁকতেন ভাল; আর বাঁশী বাজাতেন মন্দ নয়। কিন্তু শিকারে মত্ত হয়ে বাঁশী ও পেন্‌সিল দু-ই ত্যাগ করেন।

আমি অল্প বয়স থেকেই গান গাইতুম। আমার কণ্ঠস্বর ছিল musical। এই কারণে, কানে যে সুর আস্‌ত, গলায় তা বদ্‌লি হত। আমার গানের শিক্ষক ছিল বঙ্কু নামক স্কুলের ছেলে। তার গলা ছিল চমৎকার, যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি দরাজ। আর শিখি আমাদের গৃহ-শিক্ষকের কাছে। মাস্টার মহাশয়ের কণ্ঠে সুর ছিল কিন্তু স্বর ছিল না।

সে-কালে কৃষ্ণনগরে খেলাধূলোও ছিল। ভাইদের মধ্যে আমি ছিলুম দুর্ব্বল ও কৃশ, অথচ সুস্থ। অতএব খেলায় আমার কোনরূপ কৃতিত্ব ছিল না। বিদেশী খেলার মধ্যে ক্রিকেটই সকলে খেলত, আর তার নাম ছিল ব্যাট্‌বল। সে ব্যাট্‌বল খেলা ছিল এক রকম ছেলেখেলা। কেউ এ খেলায় খেলোয়াড় বলে ওৎরায় নি। অবশ্য ম্যাচও খেলা হত, কিন্তু ম্যাচ খেলার উদ্দেশ্য ছিল উভয় পক্ষে মারামারি করা। যে দল হারত, তারা অপর দলকে আক্রমণ করত। আর যারা অপরের মাথা ফাটাতে পারত, তারা প্রসিদ্ধ হত।

চার পাশের গ্রাম থেকে কৃষ্ণনগরে অনেক ছোকরা পড়তে আসত। তাদের মধ্যে দেবগ্রামের ছেলেরা ছিল মারামারিতে ওস্তাদ। তারা ছিল শরীরে বলিষ্ঠ ও গোঁয়ার। দেবগ্রামের আবহাওয়া বোধ'হয় তখন খুব ভাল ছিল, এখন সে গ্রামে ম্যালেরিয়ার একটি প্রধান আড্ডা হয়েছে। নবদ্বীপের ছেলেরাও ছিল সব জোয়ান, আর কৃষ্ণনগরের নেদের পাড়ার ছোকরারাও ছিল অনেকে বীরপুরুষ। তাদের মধ্যে কান্তি

নামে একটি যুবক ছিল। তার মত সুন্দর লোক প্রায় দেখা যায় না। আর শরীরে বলবীর্য্যও ছিল অসাধারণ।

শেষটা কলেজের আদেশে জিমনাস্টিকের চলন হল। আমি জিমনাস্টিক করতে পারতুম না, প্যারালেল বার-এ পীকক মার্চ করতে পারতুম না। আমার বাহুর সে জোর ছিল না।

কৃষ্ণনগরের নাবালক রাজার বদ্রি সুকুল নামে একটি সেতার শিক্ষক ছিল। সরকার বাহাদুর রাজকুমারের সঙ্গীত শিক্ষা বন্ধ করে তাকে জিমনাস্টিক শিখতে আদেশ দিলেন। ওস্তাদজীর চাকরি গেল। ওস্তাদজী প্রস্তাব করলেন যে, তাঁকেই জিমনাস্টিক-এর মাস্টার করা হোক। তিনি এক মাসের মধ্যেই জিমনাস্টিক শিখে নেবেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হল। তিনি ছিলেন পালোয়ান। প্যারালেল বারে তাঁর তুল্য কেউ হতে পারতেন না। আমার দেহের এইসব অক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আমি একটি বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে ডন-মুগুর ও বৈঠক চর্চ্চা করতে লাগলুম। এই ডন-মুগুরের প্রসাদে আমার দেহ গড়ে উঠল, বুক হল চওড়া, ও কোমর হল সরু। তবে শরীরের শক্তি বাড়ল কি-না বলতে পারিনে।

আমি কৃষ্ণনগরের কথা এত বেশী করে বলছি তার কারণ, উক্ত শহরই আমার মুখে ভাষা দিয়েছে আর আমার মনের কাঠামো গড়েছে। এ ছাড়া, আমি একটি মফঃস্বল শহরের চেহারার কথাও বলেছি।

কৃষ্ণনগরে নবাবী আমলের সভ্যতার নিদর্শন, আর আমাদের নব সভ্যতার স্পষ্ট গুণ rationalism-এর পরিচয় ছিল। এখন বোধ হয় কৃষ্ণনগর অপর সব মফঃস্বল শহরের নকলে গড়ে উঠেছে, তার কোনও বিশেষত্ব নেই।

আমরা অবশ্য কৃষ্ণনগরে শিকড় গেড়ে বসিনি। প্রথম প্রথম প্রায় প্রতি বৎসর পূজোর সময় হরিপুর যেতাম। হরিপুর গ্রামটি খুব ভাল লাগত। আমাদের গ্রামের উত্তরে ছিল নদী ও দক্ষিণে একটি প্রকাণ্ড বিল—তিন চার মাইল লম্বা—আর মাইল খানেক চওড়া, আর অসংখ্য পুকুর। অবশ্য বেত ও বাঁশের বনও ছিল—কেন না তখন চৌধুরী বংশের অনেকের বাড়ী-ঘর-দোর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

এ গ্রাম চাষার গ্রাম নয়, জমিদারের গ্রাম। গাঁয়ে কোনও চাষার বসতি ছিল না। সমগ্র গ্রামটিতে ছিল শুধু চৌধুরীদের ও তাঁদের দৌহিত্রদের বসতি। সকলেই ছিলেন 'বাবু'দের দল—যাদের অন্যেরা মান্য করত। চৌধুরীরা খুব বড় জমিদার না হলেও মাঝারি গোছের জমিদার এবং বহুকাল থেকে জমিদার ছিলেন।

আমাদের পরিবারের পুরুষেরা ছিলেন সুপুরুষ, আর আমার খুড়ী-জেঠীরা সব ছিলেন গৌরবর্ণ। আর প্রায় সকলেই ছিলেন চালাক চতুর। তাঁদের ছিল হাসিমুখ, ও কথায় বার্ত্তায় এঁরা হাসির চর্চ্চা করতেন।

পরস্পরের ভিতর জমি-জমা নিয়ে শরিকী বিবাদ ছিল।

কিন্তু বাহ্য ব্যবহারে তা প্রকাশ পেত না, বিশেষত পূজার সময়। আর বড়রা যথেষ্ট মদ্য পান করতেন, কিন্তু যুবকেরা নয়।

তখন গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আর প্রায় সকলেরই অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল। প্রতি বাড়ীতে দুর্গাপূজা হত, হয় মোষ, নয় পাঁঠা বলি হত—আর নবমীর দিন ছেলে বুড়ো মিলে পঙ্কোৎসব করত।

আমার মনে ও চরিত্রে শহরের ও পাড়াগাঁয়ের প্রভাব কতটা আছে বলতে পারিনে, তবে দুইয়েরই কতকটা আছে। তার ফলে আমার মনে পরস্পর-বিরোধী সংস্কার থাকা সম্ভব। তবে একটি বিষয়ে এ দু' জায়গায়ই মিল ছিল। আমাদের পরিবার ছিল গোঁড়া হিন্দু; তার অর্থ এই যে, হরিপুরের চৌধুরীরা সমাজের প্রচলিত প্রথা মেনে চলতেন, কিন্তু তাদের প্রকৃতিতে ভক্তির লেশমাত্র ছিল না। বিধিনিষেধ মানাই তাঁদের ছিল ধর্ম্ম। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব তাঁদের চরিত্রে একরকম ছিল না বললেই সত্য কথা বলা হয়। কেন না, তাঁরা ইংরেজীশিক্ষিত ছিলেন না। কাশী ছিল তাঁদের প্রিয় শহর।

বৃদ্ধরা কাশী যেতেন দেহত্যাগ করতে, আর আমি আমার একটি জেঠতুতো ভাইকে দেখেছি যিনি কিছু দিন কাশীতে গিয়েছিলেন, শিক্ষালাভ করতে। কিসের শিক্ষা জানিনে—কিন্তু শিখে এলেন শুধু তলোয়ার খেলা আর তীর ছোঁড়া। আর হাতের গোড়ায় নাটোর তাঁদের ছিল একরকম শহর।

আমি ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরেই বাস করতুম সাড়ে এগারো মাস ও হরিপুরে পনেরো দিন। কিন্তু হরিপুর আমরা সঙ্গেই এনেছিলুম, তার মানসিক আবহাওয়াও।

তা ছাড়া, আমরা নদীয়া জেলাতেও এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার বয়েস যখন আট বৎসর, তখন বাবা দ্বারভাঙ্গায় বদলি হলেন ও আমরা সপরিবারে সেখানে যাত্রা করলুম। কৃষ্ণনগর থেকে নৌকোয় মগ্‌রায় গেলুম, আর সেখানে গিয়ে রেলে চড়লুম। রাত্তিরটা ট্রেনে ঘুমিয়েছিলুম, সকালবেলায় মধুপুর পৌঁছুলুম। পাহাড় সেই প্রথম দেখলুম, যদিচ অতি ছোট ছোট। ক্রমে গরম বাড়তে লাগল—তখন বৈশাখ মাস। জসিদি স্টেশনে পৌঁছে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়লুম। কী ভীষণ গরম! আমি সেই থেকে গরম দেশকে বেজায় ভয় করি: সে ভয় আমার আজও আছে। এই গ্রীষ্মকাতরতাই আমার কর্ম্মজীবনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

বাঙ্গলার তুলনায় বেহার আমার এতটা অপ্রীতিকর লাগে যে, তার একটু বর্ণনা করা আবশ্যক।

আমরা গাড়ীতে তেতে পুড়ে বেলা চারটের সময় বাড় স্টেশনে পৌঁছলুম, অর্থাৎ বিহারে পদার্পণ করলুম। সেকালে বাড় থেকে স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে জনক রাজার দেশে যেতে হত।

বাড়ে গিয়ে শুনি, স্টীমার বাড় ছেড়ে গিয়েছে। অগত্যা আমাদের রাস্তার ধারে একটি মুদির-দোকানে আশ্রয় নিতে

হল। একদিন এক রাত সেই খাপ্‌রার ঘরে থাকবার কথা, কিন্তু সেখানে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক ছিলুম। সেই সময়টুকুর মধ্যে ক্রমান্বয়ে "রাম নাম সৎ হায়" এই ধ্বনি শুনলুম।

ইতিমধ্যে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়ে' সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনাদের এখানে থাকা হবে না— কেন না কলেরার মড়ক লেগেছে। আপনারা আমার বাড়ীতে চলুন। আমার বাসায় নীচের তলায় একটি প্রকাণ্ড ঘর আছে, সেই ঘরে আপনাদের সপরিবারে থাকতে ও খেতে দেব শুধু আলোচালের ভাত ও পাঁঠার মাংস, আর কিছুই নয়।

আমাদের দলবল বড় কম ছিল না। বাবা, মা, মাসিমা, আমরা দুটি ভাই, তিনটি বোন; আমাদের গৃহশিক্ষক দুটি কি তিনটি, আত্মীয় জন তিনেক, চাকর আর একটি বাঙ্গালী পাচক ব্রাহ্মণ, দেখতে অতি সুন্দর আর অতি বলিষ্ঠ। আমরা সদলবলে উক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ী অতিথি হলুম ও তাঁর দত্ত ভাত আর পাঁঠার ঝোল খেয়ে মাটিতে বিছানা পেতে সে রাত্রি কাটালুম। সমস্ত দিন উপবাসের পর ও-খাবার আমাদের মুখে খুব ভাল লাগল। মা ও মাসিমা কি খেলেন জানিনে। কেন না, মা জীবনে কখনও মাংস ভক্ষণ করেন নি, আর মাসিমা ছিলেন বিধবা। বোধ হয় সেদিন ছিল একাদশী।

তার পর দিন বেলা নটা-দশটায় গঙ্গায় স্নান করলুম।

বাইরে আগুন জ্বলছে, আর গঙ্গার জল যেন বরফ জল। আমরা উক্ত ভদ্রলোকের বাড়ী দু'পুরে আলোচালের ভাত ও পাঁঠার ঝোল খেয়ে বোধ হয় বেলা তিনটে চারটের সময় স্টীমারে চড়ে গঙ্গা পার হলুম। উক্ত ভদ্রলোক ছিলেন শান্তিপুরের লোক, আর তাঁর উপাধি বোধ হয় প্রামাণিক। এই সহৃদয় লোকটি আমাদের অতিশয় যত্ন করেছিলেন। তাঁর ভদ্রতার স্মৃতি আমার মনে আজও জ্বলজ্বল করছে।

গঙ্গা পার হয়ে আমরা আবার রেলে চড়লুম ও সন্ধ্যায় দ্বারভাঙ্গায় নামলুম। পথিমধ্যে দেখলুম শুধু রোদে পোড়া খাপরার চাল। এমন শুষ্ক ও নীরস দেশ ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখিনি। বাঙ্গলা দেশ সবুজ আর বিহার পাটকিলে। মনে আছে, মাঝে মাঝে আম বাগান দেখেছি।

দ্বারভাঙ্গায়ও সমান গরম। যে বাসায় গিয়ে উঠলুম, সেটি গণ্ডকের খুব কাছে। গণ্ডকের জলও ঠাণ্ডা, তাতে স্নান করে সুখ হত। দিনটি গরমে ছটফট করে, সন্ধ্যেয় বেড়াতে বেরতুম। আমার পিসতুতো ভাই গান গাইতে শুরু করলেন। মা সে গান শুনে ভয় পেয়ে বাবাকে বললেন যে, প্যারীমোহন পশ্চিমে এসে হঠাৎ গাইয়ে হয়েছে। বাবা বললেন, ভয় নেই, প্যারীমোহন মহুয়া খেয়ে গান গাচ্ছে। আর গরম সহ্য করবার জন্য মহুয়া খাচ্ছে। তিনি তখন 1st. year-এ পড়তেন আর মধ্যে মধ্যে মদ্য পান করা তাঁর অভ্যাস ছিল। আমরা মহুয়া পান করতুম না। সুতরাং দিনটে গরমে ভাজা

হতুম। বাবার ইচ্ছে ছিল যাঁরা কলেজে পড়তেন তাঁদের পাটনায় পাঠিয়ে দিবেন আর যারা স্কুলে পড়ছে তাদের দ্বারভাঙ্গার ইস্কুলে ভর্ত্তি করবেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ খবর পেলেন যে পাটনায় ভয়ঙ্কর কলেরা হচ্ছে। তাই তিনি দাদা, মেজদাদা, সেজদাদা ও আমাকে কৃষ্ণনগর ফিরে যেতে আদেশ করলেন। এক হপ্তার মধ্যেই আমরা চার ভাই মাসিমা, আমাদের গৃহ শিক্ষক ও আত্মীয়দের সঙ্গে চাকর-বামুন নিয়ে কৃষ্ণনগরে ফিরে এলুম। আমরা গোয়াড়িতে নতুন বাসায় উঠলুম ও যে যে-ক্লাসে পড়তুম সে সেই ক্লাসেই রয়ে গেলুম। কৃষ্ণনগর এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আর বেহার থেকে নিয়ে এলুম তার গ্রীষ্মের স্মৃতি। বাবা আমাদের বাংলা দেশে পাঠিয়ে ভালই করেছিলেন, কারণ যারা দ্বারভাঙ্গায় রয়ে গেল, তাদের মধ্যে দু'জন আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগ্নী উভয়েই কলেরায় আক্রান্ত হন। বোনটি সেখানে মারা গেল। আর ভাইটি ফিরে এলেন শুধু হাড় ও চামড়া নিয়ে। আমরা সাড়ে তিন বৎসর গোয়াড়িতে বাসা ভাড়া করেছিলুম। তার পর দ্বারভাঙ্গার দুর্ঘটনার দরুণ বাবা কৃষ্ণনগরে সাহেব পাড়ায় একটি বাড়ী কিনে আমাদের সকলকে সেখানে রেখে গেলেন।

কৃষ্ণনগর সেকালে খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা ছিল। আমরা নিজেদের যে বাড়ীতে উঠে গেলুম পরে পাঁচ বৎসর সেই বাড়ীতেই রইলুম, ও সপরিবারে ভালই ছিলুম। হঠাৎ ১৮৮০

খৃস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হল। দাদা ও মেজদাদা কলকাতার কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে সে ম্যালেরিয়া ভীষণ রূপ ধারণ করলো। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রতিদিন বিশ-ত্রিশ জন করে মারা যেতে লাগল। আমাদের বাড়ীতে আমি ও আমার মা ছাড়া আর সকলে জ্বরে পড়লেন। জ্বর হলেই টেম্পারেচার ১০৫"-এর নীচে হত না আর পনেরো দিনের কম ছাড়তো না। দাদা তখন বিলেতে ও মেজদাদা কলকাতায়। আমি তখন এনট্রান্স ক্লাসে পড়ছি, ও দিব্যি সুস্থ ছিলুম। কৃষ্ণনগরের ম্যালেরিয়া আমাকে স্পর্শ করেনি। এই সময় একটি রবিবারে আমি গোয়াড়ি যাই একখানি খাতা কিনতে, অবশ্য পায়ে হেঁটে। প্রায় বেলা বারোটায় বাড়ী ফিরি। পথিমধ্যে ভয়ঙ্কর মাথা ধরে, ফলে বাড়ী এসেই শুয়ে পড়ি। তার পর চোখ খুলে দেখি আমার মেজদাদা যোগেশ চৌধুরী পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এখানে এলে কবে? তিনি বললেন, শুধু আমি নই, দিদি আর মন্মথও এসেছেন আরা থেকে। আমি প্রশ্ন করলুম, কেন? মেজদাদা বললেন, তুমি আটদিন অজ্ঞান ছিলে, আজই শুধু তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তোমার অজ্ঞান অবস্থায় যে যেখানে ছিল সকলকে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, আমি ত তবে ভাল হয়ে উঠেছি? তিনি বললেন, না। তোমার জ্বর ছেড়েছে। কিন্তু দু পাশের কর্ণমূল বেজায় ফুলে উঠেছে।

ডাক্তার বাবু বলেছেন, জলের হাওয়ায় সেরে যেতে পারে, তাই তোমাকে নৌকোয় নিয়ে যেতে হবে !

আমি যখন জেগে উঠি তখন বিকেল পাঁচটা, আর সন্ধ্যে ছটায় আমাকে গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে নৌকোয় চড়ানো হল। সকালবেলা কালনায় পৌঁছতে আমার দুই কর্ণমূলের দু-খানি পাঁউরুটি—প্রায় অদৃশ্য হল। তারপর দিন বলাগড় পৌঁছে দেখি কান দুটি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েচে।

সন্ধ্যেয় গিয়ে আমরা সপরিবারে ট্রেনে চড়লুম আরা যাবার জন্য, আর তার পর দিন বেলা এগারোটা আন্দাজ ট্রেন থেকে নামলুম।

এসব কথা বলছি কি কারণে পরে বলব। আমার এতবড় রোগ হয়েছিল, আরা গিয়ে দেখি তার কোনও রেশ নেই। কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন আহারান্তে দুপুর বেলায় একখানি ইংরেজী কাগজ পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলুম যে ইংরেজী অক্ষর পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছি। ভয়ে আমার ঘাম হতে লাগল। বাবা পাশের একখানি খাটে শুয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "প্রমথবাবু, তুমি ঘামছ কেন ?" আমি বললুম, "কৃষ্ণনগরের জ্বর বোধ হয় আজ পুরো ছাড়চে।" একথা শুনে বাবা বললেন, "বটে ! দিব্যি খাচ্ছ দাচ্ছ, হেসে খেলে বেড়াচ্ছ—আর জ্বর তোমার আজ ছাড়ল ?" আমি বললুম, "এ জ্বর বর্ণ-চোরা জ্বর।" একথা শুনে বাবা হেসে বললেন, "ছেলে আমার তুখোড় বটে !" আমি আর কিছু

বললুম না। কিন্তু মন স্থির করলুম যে, আর সাত দিন কোন ইংরেজী বই ছোঁব না। আর "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" পড়তে লাগলুম। সাত দিন পরে Golden Treasury-র Songs and Lyrics পড়ে দেখি যে ইংরেজীর জ্ঞান আবার বেবাক ফিরে এসেছে।

আমার যে কি ব্যারাম হয়েছিল তা আমি জানি নে। কেন না, তার পর চার বৎসরের মধ্যে আমার একদিনও জ্বর হয় নি। Sunstroke হতে পারে কিন্তু তার ফলে কর্ণমূল ফুলবে কেন? আর তার ফলে ইংরেজী ভাষার স্মৃতি লোপ হবে কেন, ও আট দিন অচৈতন্য থাকব কেন?

আমার ইন্দ্রিয় সব সজাগ ছিল, কেবল মনের একাংশ সাময়িকভাবে লুপ্ত না হোক, সুপ্ত হয়েছিল।

২

কি কুক্ষণেই আত্মকথা লিখতে বসেছি! প্রথম থেকেই লেখায় পদে পদে বাধা পড়ছে।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হলেন, যে-রোগে শেষটা তাঁর মৃত্যু হয়। একথা আমি পূর্ব্বে বলেছি।

তারপর উপর্য্যুপরি নানা পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটতে আরম্ভ হল। ফলে বিপর্য্যস্ত মন নিয়ে মধ্যে মধ্যে কলম চালিয়েছি।

কতকটা এগিয়েছি, এমন সময় বর্ত্তমান যুদ্ধ আমাদের গা ঘেঁষে এল। আমি কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে

এলুম। বলা বাহুল্য, মরুভূমির ভিতর ওয়েসিস আমরা ইচ্ছে করলেই গড়ে তুলতে পারিনে। বাইরে শান্তি থাকলেও মনে শান্তি থাকে না। এখানে সঙ্গীতের ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা করা হচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধের অবসানে সঙ্গীত ও শিল্পকলার কোনও সার্থকতা থাকবে কি-না জানিনে। জার্ম্মানী সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও জাপান চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী। অথচ এ দুই জাতই এ দুই বিদ্যার ধ্বংস-সাধন করতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছে। দেশ যখন ওলট-পালট হতে বসেছে, তখন আত্মকথার কোন সার্থকতা নেই। আমি লিখতে পারি, কিন্তু পড়বে কে ?—সাহিত্য হচ্ছে অর্দ্ধেক সঙ্গীত, অর্দ্ধেক চিত্রকলা,—এই কথাটা মনে রাখবেন। আর এক মুস্কিল। গত সংখ্যায় "রূপ ও রীতি"তে আত্মকথা পড়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ছাপার অক্ষরে এত ভুল পূর্ব্বে কখনও দেখিনি। "রূপ ও রীতি"র পরিচালক আমাকে লিখেছেন যে—প্রথমতঃ কাগজ পাওয়া যায় না, তারপর লোকও পাওয়া যায় না। আজ যে কাজ করে, কাল সে অদৃশ্য হয়। এ অবস্থায় ছাপার অক্ষরের পক্ষে হাতের লেখার অনুসরণ করা অসম্ভব। যুদ্ধের আঁচ লেগেই যখন ছাপাখানার এরূপ অবস্থা, তখন যুদ্ধের আগুন জ্বললে তার অবস্থা কি হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কাগজ সহজেই পোড়ে।

আমাদের দেশ পরাধীন দেশ, আর পরাধীনতায় আমরা কেউই সন্তুষ্ট নই। ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বাধীন হতে চাই।

অপর পক্ষে আমরা অধীনতায় অভ্যস্ত হয়েছি। আর এমনি অভ্যস্ত হয়েছি যে, আমাদের কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের অধীনতা। মানুষ সব অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়; আমরাও নিয়েছি। এই অধীনতার ধাত বদলাতে আমরা ভয় পাই, বিশেষত যখন নূতন অধীনতা ধ্বংস-মূলক। ভাবনা এখন ভবিষ্যতের জন্য, অতীতের জন্য নয়। আর আমার আত্মকথা অতীতের কথা। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে দোলাচল চিত্তবৃত্তি নিয়ে আত্মকথা লেখা একরকম অসম্ভব। জীবনের খেঁই হারিয়ে যায়।

তা হলেও আমি তেরো বৎসর বয়সে আবার পদার্পণ করি।

বেহার আমার পূর্ব্বপরিচিত। আমি যখন সিক্স্থ ক্লাস-এ পড়ি, তখন আমি গ্রীষ্মকালে দ্বারভাঙ্গায় যাই। তখন বেহার ছিল একটা বিভীষিকা, সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। তারপর যখন ফোর্থ ক্লাস-এ পড়ি, তখন শীতকালে মজঃফরপুরে যাই। এ শহরটি আমাকে মুগ্ধ করে। যদিও সন্ধ্যেবেলায় ঘরে আঙ্গুটি জ্বালাতে হত। আমাদের কাছে ওটি ছিল একটি বাঙ্গালী শহর। আমি শহরের যে অংশ দেখি, সেটি ছিল অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার উপর সেখানে ঘোড়দৌড় হত। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাড়ীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আয়না ঝোলানো থাকত; আর শহরের আশে পাশে দেদার আম লিচুর গাছ ছিল। সেখানে দু-একটি ছোকরার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তার ভিতর কানাই নামে একটি ছোকরার

কথা আজও মনে আছে। ছোকরাটি ছিল দেখতে ভাল ও বেজায় স্ফূর্ত্তিওয়ালা। শুনেছি, কানাই পরে মোক্তার হয়েছিল ও বড় মোক্তার হয়েছিল। কিন্তু অল্প বয়সে মদ খেয়ে মারা যায়। আমার মতে বেহার গ্রীষ্মকালে নরক আর শীতকালে স্বর্গ।

তার পর যখন সেকেণ্ড ক্লাস-এ পড়ি, তখন শীতকালে ভাগলপুর যাই। ভাগলপুরও তখন ছিল একরকম বাঙ্গালী শহর।

ভাগলপুরের বড় বড় উকিলরা ছিলেন সব বাঙ্গালী, যথা—সূর্য্যনারায়ণ সিং, শিবচন্দ্র, অতুল মল্লিক প্রভৃতি। ভাগলপুরে সে সময়ে উকিলবাবুরা বেজায় মদ্যপান করতেন, একমাত্র সূর্য্যনারায়ণ সিং ছাড়া। ভদ্রলোক একটি চমৎকার বাড়ীতে বাস করতেন; শুনেছি সেটি পূর্ব্বে গবর্নরের বাড়ী ছিল।

ভাগলপুর তেমন সুদৃশ্য শহর ছিল না। তার পশ্চিমে ছোট একটি পাহাড়ের উপর Cleveland House নামে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। নিচে গঙ্গা, উপরে পাহাড়—জায়গাটা ছিল মনোরম। এখন সে বাড়ীর মালিক পাথুরেঘাটার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরবংশ। এইখানেই অতুল মল্লিকের পুত্র বসন্ত মল্লিকের সঙ্গে পরিচিত হই; পরে তিনি I. C. S. পাস করে পাটনার জজ হন। মল্লিকমহাশয়ের অন্যান্য পুত্রদের সঙ্গেও কলকাতায় আমি বিশেষ পরিচিত হই। তাঁদের সঙ্গে আমি একসময়েই বিলেতে ছিলুম।

আরা ছোট শহর, মজঃপুর ও ভাগলপুরের মত বড় নয়। কিন্তু অতি স্বাস্থ্যকর জায়গা। আমি প্রায় চার মাস সে শহরে বাস করি, কিন্তু আমাদের পরিবারে কারও এক দিনের জন্যও অসুখ করে নি। আর আমরা সকলেই অতি মোটা তাজা হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলুম। সেখানে আমরা ডিসেম্বর মাসেও ঠাণ্ডা জলে স্নান করতুম, কিন্তু একদিনের জন্যও সর্দ্দিকাশিতে ভুগিনি। আরা হিন্দুস্থানী কায়স্থপ্রধান জায়গা। লালারাই সে শহরের প্রধান সম্প্রদায় ছিল। তাদের পয়সা ছিল, তার প্রমাণ পেতুম তাদের অসম্ভবরকম স্ফীত উদরে। এত পেটমোটা লোক আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখিনি। এত বিশাল উদর নিয়ে এরা যে কি করে কাজকর্ম্ম করে বুঝতে পারতুম না। ডালরুটি খেয়ে খেয়ে মানুষ যে ভাঁটার মত গোলাকার হতে পারে, এ জ্ঞান আমার ছিল না। আরা সেকালে বাঙ্গালীপ্রধান শহর ছিল না। সেখানে ছুটিমাত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখি,—কৈলাসবাবু নামক একটি উকিল ও আমার বন্ধু সোমনাথ মৈত্রের ঠাকুরদাদা চন্দ্রনাথ মৈত্র। তিনি ছিলেন আরা স্কুলের হেড মাস্টার। কৈলাসবাবুর পুত্র ব্যারিস্টার নলিনী বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে আমার বিলেতে পরিচয় হয়। সে ছিল অসাধারণ বলিষ্ঠ ও সহৃদয় লোক।

আরায় সন্ন্যাসীদের একটি সদাব্রত ছিল। অসংখ্য সন্ন্যাসী সেখানে ছু-একদিন থেকে স্থানান্তরে চলে যেত। আমাদের বাসা ছিল লহরের (canal) পাশে। সাধু বাবাজীরা লহরে

স্নান করতে আসত, ও তাদের শিঙ্গারপটার করতে ঘণ্টাখানেক লাগত। স্নান করে উঠে তারা একঘণ্টা ধরে ছাই মাখত ও কেশবিন্যাস করত। চুল মাথার উপর চূড়ো করে বাঁধত। ফলে তাদের আর শীত লাগত না।

আরায় একটি বাড়ী ছিল যেখানে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা আশ্রয় নিয়েছিল ও নিজেদের রক্ষা করেছিল। আমরা যখন আরায় যাই, তখনও সে বাড়ীর দেওয়ালে গুলির দাগ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের বছর পঁচিশ বাদে আমরা আরায় যাই, ও সে বিদ্রোহে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে কোনও কোনও লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়; ব্রাহ্মণ, ছত্রী, আহীর, ছুতোর, কামার প্রভৃতি। লালারা অবশ্য এ যুদ্ধে যোগ দেয়নি। আরার আহীররা ছিল সকলেই দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ। ছত্রীরাও তাই। এদের মুখে মিউটিনির গল্প শুনতে আমাদের খুব ভাল লাগত। কুমার সিংহ এদের সকলেরই ছিল আদর্শ হিরো।

আরা থেকে আমরা আর কৃষ্ণনগরে ফিরলুম না, এলুম কলকাতায় বসবাস করতে অর্থাৎ পড়তে; যেমন আমরা কৃষ্ণনগরে বসবাস করতুম সেখানে পড়তে। ছেলেরা যাতে M. A., B. A. পাস হয়, বাবার সেদিকে খুব ঝোঁক ছিল।

কলকাতায় যখন ফিরলুম, তখন আমার বয়েস সাড়ে তেরো বৎসর। তখন আমি নতুন মানুষ। দেহ হয়েছে সুস্থ, সবল ও সুঠাম; আর মনের মোড় ফিরে গিয়েছে। আমি অঙ্ক কষতুম

ভাল, ক্লাসের পরীক্ষায় একশ মার্কের ভিতর অন্তত নব্বই পেতুম। যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি, তখন আমি Wood's Algebra-র সব equation সহজেই কষতে পারতুম—যা আমার গৃহশিক্ষক মোটেই পারতেন না। অঙ্ক কষারও একটা instinct আছে, সকলের থাকে না।

কিন্তু আরা থেকে যখন ফিরে এলুম, তখন অঙ্কের প্রতি আমার কোন অনুরাগ ছিল না। তখন সাহিত্য আমার প্রিয় হয়েছিল। Bulwer Lytton-এর নভেল, George Eliot-এর Adam Bede আর Golden Treasury-র Songs and Lyrics আমি উল্টেপাল্টে পড়তুম। কেন না, আরায় এই জাতীয় বই সব আমাদের বাড়ীতে ছিল। আজ যে আমি সাহিত্যিক, সে ঐ রোগ আরোগ্যের গুণে।

ইতিপূর্ব্বে কলকাতা শহরের শুধু নামই শুনিনি, চোখেও দেখেছিলুম। আমার বয়েস যখন নয়, তখন এক বেলার জন্যে কলকাতা এসেছিলুম। এসে পৌঁছই দুপুরবেলা আর সন্ধ্যের পরই ফিরে যাই। কলকাতায় দেখলুম রাস্তা চওড়া, সন্ধ্যের পর রাস্তায় আলো আছে। কিন্তু সেখানে টিঁকতে পারলুম না দুর্গন্ধের চোটে। কৃষ্ণনগরের গায়ে বিকট গন্ধ ছিল না।

তার পর দশ বৎসর বয়সে কলকাতায় আসি মজঃফরপুর যাবার পথে। এবারও দেখি খাবারে গন্ধ। গন্ধ আসে কোত্থেকে? সেকালে উনুনে কাঁচা কয়লা পোড়ানো হত। তার পর বারো বৎসর বয়সে আবার কলকাতা এসে তিন-চার

দিন থাকি, ইডেন হসপিটাল লেনে। তখন এ গলিটিকে চাঁপাতলা লেন বলত। সে বাড়ীতে নদে জেলার অনেক যুবক ছিলেন। তাঁরা ডাক্তারী পড়তেন। ফলে বাসাটি ছিল মড়ার হাড়ে ও খুলিতে ভরতি।

আমি যখন কলকাতায় পড়তে এলুম, তখন আমরা নিমু খানসামার গলিতে একটি বাসায় উঠলুম। সে রাস্তা এখন ইডেন হস্‌পিটাল-ভুক্ত হয়েছে। কলকাতায় তখন বিশেষ গন্ধ পাইনি। কিন্তু নিমু খানসামার গলিতে বেশী দিন থাকতে পারলুম না ;—গলির দোষে নয়, বাড়ীর দোষে।

আমাদের কৃষ্ণনাগরিক বন্ধুরা এ বাড়ী আমাদের জন্য ভাড়া করেছিলেন। মাসখানেক পরে বৈঠকখানা বাজার রোডে একটি বাড়ীতে উঠে গেলুম। বাড়ীটি ছোট কিন্তু বাসযোগ্য। সে বাড়ীর পূর্ব্বে ছিল মুসলমান বস্তি, আর পশ্চিমে ছিল খৃস্টান ভদ্রলোকদের বাসা। বছরখানেক সেখানে থাকি। তার পর বছর দুয়েক হুজুরীমলের গলিতে উঠে যাই।

এবার কলকাতা আমাদের ভাল লেগেছিল ; কারণ এ শহরে তখন ম্যালেরিয়া ছিল না, সংক্রামক রোগও ছিল না। তারপর গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণনগরের মত গরমও ছিল না। সন্ধ্যের সময় দিব্যি দক্ষিণে হাওয়া বইত—যে হাওয়া কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যেত না। আমরা সন্ধ্যেবেলায় গোলদীঘির ধারে গিয়ে আরামে বসে থাকতুম।

আমি কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হই এবং এনট্রান্স

ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করি। কলকাতার স্কুলকলেজের কথা পরে বলব। স্কুলের বেশী ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। যারা সন্ধ্যেবেলায় গোলদীঘিতে হাওয়া খেতে যেত, তাদের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়। তাদের দু-একজনের নাম আমার আজও মনে আছে। পূর্ণ আড্ডি বলে হুগলীর একটি ছেলে ছিল। ভাল ছেলে। আর একটি ছেলে আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে ওঠে, তার নাম গোকুল চাটুয্যে। সে লেখাপড়ায় ভাল ছিল না, কিন্তু জিমনাস্টিকে সকলের সেরা ছিল। ছোকরাটি ছিল অতি বলিষ্ঠ ও দিলদরাজ। থাকত কালী সিংহির গলিতে। কি জন্য সে আমার বন্ধু হয়ে ওঠে, তা পরে বলব। আরও জনকতক ধনীসন্তানের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় নি।

হেয়ার স্কুলে আমার সহপাঠীদের মধ্যে হেমচন্দ্র খাস্তগির এখনও বর্ত্তমান। স্কুলে তিনি আমাদের চোখে পড়েন নি, কিন্তু পরে তিনি কৃতী হয়েছেন। নীলু দত্ত নামে একটি গন্ধবণিক ছোকরার সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। ছোকরাটির ছিল মস্ত বড় চোখ; নানারকম ঠারঠোর দেখাতে পারত।

আমরা পদ্মাপারের বাঙ্গাল, এবং ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগর থাকলেও আহার সম্বন্ধে দেশের আহারেই অভ্যস্ত ছিলুম। আর্‌র হিন্দুস্থানী বাবুর্চ্চির হাতের ডাল রুটি ও মাংস ছিল খুব মুখরোচক ও পুষ্টিকর আহার।

কলকাতায় এসে আমাদের কলকাতার আহার মনঃপূত হত না। ঝাল আমাদের মুখে মিষ্টি লাগত। সুতরাং ঝাল বেশি খেতুম। মাস দুই পরে আবিষ্কার করলুম যে, আমাদের বুক জ্বালা করছে। আমরা ভাইরা পরামর্শ করে আহারে ঝালের মাত্রা কমিয়ে দিলুম, বুকের জ্বালাও কমল।

সে যাই হোক্, আমাদের স্বাস্থ্য কলকাতায় ভাল ছিল। আমরা যখন কলকাতায় দাদা তখন বিলেতে, বাবা পশ্চিমে; সুতরাং আমরা ছেলেরাই হয়েছিলুম বাড়ীর কর্ত্তা। তার ফলে সাংসারিক হিসেবে আমাদের চোখ কান খুলে গেল। আমরা ছোকরা বয়সেই গৃহস্বামী হয়ে উঠি।

আমি আমার কলকাতা বাস এবং এই শহরে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার কথা বলবার জন্য লিখতে বসেছি। কিন্তু আজকের দিনে কলকাতার ভগ্নদশায় সে বিষয় কিছু বলতে মন সরছে না। কৃষ্ণনগরে জনৈক ডাক্তারবাবুর মুখে শুনেছিলুম যে সেকালে ইউরোপে প্লেগ বলে একটি ভীষণ মারাত্মক রোগ ছিল। আমি বড় হয়ে কলকাতা শহরে প্লেগের প্রকোপ দেখেছি।

আজ দু বৎসর থেকে air-raid-এর কথা শুনছি। কিন্তু কলকাতায় যে air-raid হতে পারে, তা কখনও ভাবিনি। আজকাল শুনছি জাপানীরা নাকি আমাদের মাথায় বোমাবর্ষণ করবে। ফলে বিজলী বাতি উদ্‌ভাসিত কলকাতা থেকে বহুলোক পলায়ন করেছে, আমিও তাদের মধ্যে একজন।

কলকাতার এই কৃষ্ণপক্ষ কেটে না গেলে ভারতবর্ষের রাজধানীতে হয়ত ফিরব না। এ অবস্থায় লিখতে কি মন সরে ?

আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে, সাড়ে তেরো বৎসর বয়সে আমি কলকাতায় পড়তে আসি ; চিড়িয়াখানা দেখতেও নয়, যাতুঘর দেখতেও নয়। পৃথিবীর অপর দেশের বহু জীবজন্তুর ছবি আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি ; তাদের সশরীরে দেখবার আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। আর যাতুঘরে সেকালে ছিল অধুনালুপ্ত সেকেলে অতিকায় জীবদের কঙ্কাল মাত্র। সেই সব হাড়ের সঙ্গে পরিচয় লাভ করবারও কোনরূপ লোভ আমার ছিল না।

আমি কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি হই। সেকালে বোধ হয় ট্রান্সফার-এর কোন হাঙ্গামা ছিল না। হেয়ার স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলের চেয়ে ঢের ভাল ছিল। যদিও ইস্কুল বাড়ীটি সে কলেজের তুলনায় ক্ষুদ্র, আর সেরকম দর্শনধারী মোটেই ছিল না। ঘরগুলি ছিল ছোট ও বিশেষত্বহীন। কৃষ্ণনগর কলেজের ঘরগুলি ছিল প্রকাণ্ড উঁচু, আর তার দেয়ালগুলি ছিল অতি সুন্দর পঙ্কের কাজ করা, ডিমের খোলার মত তার চেহারা। পরে তা জনৈক ইংরেজ প্রিন্সিপালের মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি মানুষের মাথার সমান মাপে আলকাতরা দিয়ে দেয়াল ঢেকে দিয়েছিলেন। আমার সে বয়সেও মনে হয়েছিল এরই নাম

বিলাতী vandalism। আর সে কলেজের হাতা ছিল বিরাট; যাতে ইচ্ছে করলে এক ডজন ফুটবল খেলার মাঠ হতে পারত। হেয়ার স্কুল ছিল রাস্তার ধারে, প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণে। মাঝখানে একটু সঙ্কীর্ণ জমি ছিল, যেখানে টিফিনের সময় স্থূলকায় ছাত্রেরা বাড়ী থেকে পাঠানো বাটি বাটি দুধ খেত। এ ব্যাপার আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখিনি বলে' আমার কাছে বড় অদ্ভুত ঠেক্‌ত। যাদের বাড়ী থেকে দুধ আস্‌ত না, সে-সব ছেলে উক্ত দুগ্ধপায়ীদের নানারকম ঠাট্টাবিদ্রূপ করত, যথা: "বাড়ী থেকে মাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই ত বেশ কোলে বসে' দুধ খেতে পারতিস্!"

যাক্ এ সব কথা।

ভোলানাথ পাল তখন হেয়ার ইস্কুলের হেড্ মাস্টার ছিলেন। তিনি ইংরেজী চমৎকার পড়াতেন। সত্য কথা বলতে গেলে, ইংরেজী ভাষার phrases and idioms-এর সঙ্গে তিনিই আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। সেকেণ্ড মাস্টারের নাম মনে নেই। তিনি ছিলেন চেহারায় হেড্ মাস্টারের ঠিক বিপরীত। তাঁর নাক ছিল বাঁশির মত, আর চোখ চক্‌চকে। আর ছিল লম্বা পাকা দাড়ি; তার প্রথম অংশটা তামাটে, তার পর সাদা। ছেলেরা বলত তিনি গাঁজা খান। বোধ হয় তাঁর শ্মশ্রুর ঐ তাম্র বর্ণ দেখে। তাঁকে ছেলেরা অত্যন্ত ভয় করত, যদিচ আমি তাঁকে কখনো কাউকে কড়া শাসন করতে দেখিনি। তাঁর একটি কথা আমার আজও মনে আছে।

তিনি হেড মাস্টারকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, কেশব, কাল সখী হয়ে নৃত্য করেছেন। এর পর বোধ হয় ব্রাহ্মরা সকলে বোষ্টম হয়ে গড়াগড়ি করবে।—স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আমরা কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব পাঁচটি ছাত্র হেয়ার স্কুলে এসে ভর্ত্তি হই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লালগোপাল চক্রবর্ত্তী। সে ছিল দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি বলিষ্ঠ ও পড়াশুনায় খুব ভাল। লালগোপালের মৃগীরোগ ছিল। ক্লাসে এসে কখনো কখনো অজ্ঞান হয়ে যেত; মাস্টাররা সব ভীত হয়ে পড়তেন। আমরা কৃষ্ণনাগরিকরা মাথায় একটু জল দিয়ে পাঁচ মিনিটেই তাঁকে সজ্ঞান করতুম। পণ্ডিতমশায় আমাদের কখনো ভাল নজরে দেখেন নি। কেন জানিনে। বিশেষত আমার উপর তাঁর যেন একটা আক্রোশ ছিল। যদিচ আমরা ক্লাসে অতি ভালমানুষ ছোক্‌রা ছিলুম। তাঁর একটি ব্যবহার আমার আজও মনে আছে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার মাসখানেক পরে আমি ও আমার বন্ধু গোকুল চাটুজ্যে একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। পণ্ডিত মশায় অপর ফুটপাথে কোথায় যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি রাস্তা পার হয়ে আমাদের ফুটপাথে এলেন। এসে প্রথমেই বললেন, "কিহে চৌধুরী, খুব বাবু সেজে বেরিয়েছ যে!" আমি বল্লুম, "হয়ত তাই।"

—পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে, তা বোধ হয় জান?

—হাঁ, পণ্ডিতমশায়, জানি।

—পাশ, না ফেল ?

—পাশ।

—তুমি পাশ !

—হাঁ, ফার্স্ট ডিভিশনে।

তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে অপর ফুটপাথে চলে গেলেন। বছর চল্লিশ পরে আমি তাঁর অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়েছিলুম। যদিচ বীরবল ইতিমধ্যে তাঁকে ঠাট্টাঠুট্টি করে' লিখেছিল।

হেয়ার ইস্কুলে থাকতে আমি কলকাত্তাই ছেলেদের প্রতি তেমন অনুরক্ত হইনি। তাদের কথাবার্ত্তা ছিল বিরস, তাদের ভাষা ছিল খেলো, আর তাদের রসিকতা সব বস্তাপচা। তাদের মধ্যে একটি ছোকরা—গোকুল চাটুজ্যের আমি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠি। আমি একদিন ক্লাসে ঢুকছি, এমন সময় বিনোদ গুপ্ত নামে দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা একটি ছোকরা আমাকে কোন একটি নামে সম্ভাষণ করে, যা আমার কানে অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। আমি তার গালে এক চপেটাঘাত করি ; যদিচ আমি তখন বালক, আর গুপ্তজা যুবক। অমনি তার দলবল আমাকে মারতে উদ্যত হয়। এমন সময় গ্যালারি থেকে একটি ছোকরা লাফিয়ে পড়ে' চীৎকার করে বল্লে : যে প্রমথ চৌধুরীর গায়ে হাত দেবে, তাকে আমি খুন করব। ছোকরাটি ছিল ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্ট আর অতিশয়

শক্তিশালী। আমি তাকে পূর্ব্বে চিনতুম না; এই ঘটনায় তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। তারই নাম গোকুল চাটুজ্যে। পরে সে আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে। উপরন্তু সে আমার ফাইফরমাস খাটত। বড়বাজারে আমার সঙ্গে যেত, কাপড় কিনে দেবার জন্য। আমার পরিচিত একটি ছোক্‌রা তার বাড়ীতে জোড়াবাগানে নিয়ে যেত। হেয়ার ইস্কুলে আমি ক্রমে আবিষ্কার করি যে, অনেকের কাছে আমি 'ললিতা' বলে পরিচিত ছিলুম। আমি একটি ছোক্‌রাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি এ নামের অর্থ কি?—সে বলে, "তুমি রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' পড়নি?" আমি বলি, "না।" সে বলে, "একখানি 'ভগ্নহৃদয়' কিনে পড়, তাহলেই জানতে পারবে যে, ললিতার সঙ্গে তোমার কি মিল আছে।" তার কথায় আমি 'ভগ্নহৃদয়' কিনে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

আমি 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে মুগ্ধ হইনি, এবং ললিতার সঙ্গে আমার মিল কোথায়, তাও বুঝতে পারিনি। 'ভগ্নহৃদয়'-এ দু'টি-চারিটি প্রাকৃতিক বর্ণনা আমার খুব ভাল লাগে। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান ইস্কুলের ছেলেরা গাইত। তার প্রথম কথাগুলি "প্রেমের কথা আর বোল না।" শুনলুম এর সুরের নাম ইটালিয়ান ঝিঁঝিট। ঝিঁঝিট আমি জানতুম, কিন্তু ইটালিয়ান ঝিঁঝিট কাকে বলে জানতুম না। এর থেকে আমার ধারণা হয় যে, কলকাতার ছেলেরা

সঙ্গীতছুট। পরে অভিজ্ঞতায় সে মতামত আমার দৃঢ় হয়েছিল। কেন, সে কথা পরে বলব।

এর পর আমি হেয়ার ইস্কুলের উত্তরের মাঠ পেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকলুম। কলেজ হচ্ছে মনোজগতে একটি নতুন রাজ্য। আমার ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলে-পড়া বিদ্যে ইংরেজী স্কুলেও আমার সহায় হয়েছিল। কলেজে এসে দেখি সে বিদ্যেতে আর কুলোয় না। ইতিহাস পড়তে হল রোমের আর গ্রীসের। অঙ্ক ট্রিগনমেট্রি, কনিক-সেক্সন প্রভৃতি শিখতে হল। লজিক নামে একটা নতুন শাস্ত্র শিখতে হল। আর তখন ফার্স্ট আর্টসে ফিজিক্স পড়তে হত। এ ফিজিক্স আমার কাছে একটা যাদু বিদ্যা বলে মনে হত। কলেজে আমাদের ফিজিক্স-এর অধ্যাপক ছিলেন এলিয়ট সাহেব। তিনি ছিলেন senior wrangler, গণিত বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি experiment ভাল করতে পারতেন না। কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে বস্তুর গতিবিধি সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে আমি ফিজিক্সের অতি ভক্ত হয়ে পড়ি। এলিয়ট সাহেব ব্যতীত অপর কোন শিক্ষকের কথা আমার মনে নেই—দুটি ছাড়া। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন ছিলেন আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক। তিনি ছিলেম অতিশয় ভদ্র এবং সুরসিক ব্যক্তি। তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়ে আমরা সুখ পেতুম। আর বিপিন গুপ্ত ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক, তিনি ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমান ও প্রাণবান। তিনি রাজসাহী কলেজ থেকে বদলি

হয়ে প্রেসিডেন্সিতে এসেছিলেন। সে কারণ, ছেলেদের একটু সমীহ করতেন। এ কথা তিনি আমাকে বহুকাল পরে বলেছেন। তা ছাড়া, এ কলেজে জনকতক পয়লানম্বরের ছেলে ছিল, যারা এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম দশজনের শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল। তাদের ভিতর প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন। আর আমার যতদূর মনে পড়ে সিভিলিয়ান কিরণ দে'র দাদা সতীশ দে আর একজন, যিনি পরে বর্দ্ধমানে ডাক্তারী করে' সেখানে প্রভূত অর্থ এবং খ্যাতি অর্জ্জন করেন। আর সূর্য্যকুমার কার্‌ফর্‌মা নামক আর একটি ছোকরা ছিল, যে পরে শুনেছি আগ্রা কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক হয়। কোন হিন্দুস্থানী যুবক আমাকে পরে বলেন যে, তাঁর তুল্য অধ্যাপক সে কলেজে আর কেউ ছিল না। অনুকূল দাসগুপ্ত বলে আর একটি ঘোর ব্রাহ্ম যুবক ছিল, যে পরে বিলেতে গিয়ে ভেস্তে যায়।

আমার অবশ্য এ দলের ছোকরাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না। হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুলের ছেলেরা ঘরে ঢুকতেই ডান ও বাঁ পাশের বেঞ্চি অধিকার করে বসত। হিন্দু স্কুলে নারায়ণপ্রসাদ শীল নামক একটি ছোকরার সঙ্গে আমার অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয়; তিনি আজও বর্ত্তমান। তিনি আমাকে গায়ক লালচাঁদ বড়ালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি ক্রমে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠেন। লালচাঁদ অল্প বয়স থেকেই গান গাইতেন, এস্রাজ, হারমোনিয়ম ও বাঁয়াতবলা বাজাতেন।

পরে তিনি একজন গাইয়ে বাজিয়ে হয়ে ওঠেন। তাঁর গলা ছিল জাদরেলী, আর বাজনায় হাত ছিল কড়া। পরে দুই-ই অনেকটা মোলায়েম হয়ে আসে। আমি সেকালে একটি সহপাঠীকে হারমোনিয়ম শিক্ষা করতে দেখি। তিনি "বউ আমাকে কাট্‌না কেটে কিনে দেবে বাজনা," এই বাহারের গৎটি মক্স করতেন। লোককে বানান করে পড়তে শুনলে যেরকম হাসি পায়, তাঁর এই বাদ্যশিক্ষার পদ্ধতি আমার তেমনি হাস্যকর মনে হত। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, কলকাতার ছেলেরা ছিল সঙ্গীতছুট। সেকালে দুটি গান রাস্তাঘাটে সকলেই গাইত, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান থেকে ইস্কুলের ছেলে পর্য্যন্ত। সে দুটি হচ্ছে—"আয়লো অলি কুসুম তুলি," আর "যমুনা পুলিনে বসি কাঁদে রাধা বিনোদিনী।" ভাবে ও ভাষায়, সুরে ও তালে, এমন খেলো গান আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো শুনিনি। রবীন্দ্রনাথের গান তখন কেউ জানতও না, লালচাঁদ অবশ্য এ সব গান গাইত না। সে গাইত সেকালে প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীত। আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগৃহীত আদি ব্রহ্মসঙ্গীত সে জানত। লালচাঁদের ঠাকুরদা প্রেমচাঁদ বড়াল ছিলে একজন আদি ব্রাহ্ম; তাঁদের বাড়ীতে হপ্তায় একদিন যে সমাজ হত, তাতে লালচাঁদকে অল্পবয়স থেকেই গান গাইতে হত। আমি তার সঙ্গে মিশে বহু গানবাজনার আসরে উপস্থিত থাকতুম। আমার মনে আছে যে, আমি লালচাঁদের

সঙ্গে মহেন্দ্র চাটুজ্যে নামক জনৈক প্রসিদ্ধ হারমোনিয়াম বাদকের বাড়ীতে গিয়েছি। তাঁর বাজনা আমার ভাল লাগেনি। যদিচ অনেকে আহা উহু করেছিল। তিনি ছিলেন ধনী নন, কিন্তু ঘোর বাবু। শুনেছি সেকালে গোলাপ জলে স্নান করতেন। পরে তিনি নোট জাল করে' আন্দামানে যান। সেখান থেকে ফিরে আসবার পরেও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। চেহারা তাঁর একই ছিল, কিন্তু তিনি তখন আর গুণী ছিলেন না।

আমি বলতে ভুলে গিয়েছি যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে আর একটি যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর নাম জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়; গোবরডাঙ্গার বড় জমিদারের পুত্র। তিনি ছিলেন চেহারায় আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনন্যসাধারণ। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, চোখ নীল আর চুল কটা। এমন বূঢ়োস্ক বৃষস্কন্ধ মহাভুজ পুরুষ বাঙ্গালীর মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি Wards Institution-এর ছাত্র ছিলেন। আর শিখেছিলেন কুস্তি করতে, ঘোড়ায় চড়তে ও সেতার বাজাতে। প্রথম প্রথম আমি তাঁর সঙ্গীতচর্চ্চার কোন পরিচয় পাইনি। পরে তিনি বাঙ্গলার ভিতর শ্রেষ্ঠ সুরবাহার বাজিয়ে হয়ে ওঠেন। এবং আমাদের পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। সে অনেকটা আমার সেজদা কুমুদনাথ চৌধুরীর প্রসাদে। সেজদা ছিলেন শিকারমত্ত, আমি ছিলুম সঙ্গীতভক্ত। এই দুই কারণে জ্ঞানদার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব

পাকা হয়ে ওঠে। আর সে বন্ধুত্ব তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট থাকে।

ফার্স্ট ইয়ারের সহপাঠীদের মধ্যে নারায়ণপ্রসাদ শীল ও জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ব্যতীত আর কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব টেকসই হয়নি। তা যে হয়নি, তার কারণ ভাল ছেলেদের কোন দল ছিল না। তারা সকলেই ছিল স্ব স্ব প্রধান ও গম্ভীর প্রকৃতির। তা ছাড়া, জনকতক ধনী ছেলে এবং জামাইও ছিল। তারা যে কি জন্য কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল, তা আমি জানিনে; সম্ভরত আর পাঁচজনকে নিজেদের বেশভূষার বাহার দেখাতে। এ দলের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি।

তার পর সেকেণ্ড ইয়ারে উঠলুম। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত হিন্দু স্কুল থেকে আমাদের কলেজে এসে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হলেন। তাঁর সঙ্গে আমি পরিচিত হই। তিনি সেই বয়সেই কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে বক্তৃতা করতেন। তিনি পরিণত বয়সে চমৎকার বক্তা হয়ে ওঠেন, বাঙ্গলা ইংরিজি দুই ভাষাতেই! তিনি বোধ হয় আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। আজও তিনি নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা করেন। এই দু-তিন বৎসর কলিকাতা বাসের ফলে আমার এ সহরের প্রতি মায়া জন্মায়। সেটা আমি আবিষ্কার করি আমার কলকাতা ত্যাগ করবার সময়। আমি কি জন্য কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হই, তা পরে বলব।

আমি আবার কৃষ্ণনগর ফিরে যাই; সেখানে গিয়ে কলকাতার অভাব অনুভব করি। কৃষ্ণনগরে প্রথমে বাড়ীতে ভাল করে' ফুলের বাগান করতে প্রবৃত্ত হই। আমাদের পূর্ব্বোক্ত গৃহশিক্ষক আমাদের বাড়ীতে এসে অধিষ্ঠান করেন,— শিক্ষক হিসেবে নয়, সরকার হিসেবে। তিনি আমাকে বাগান করার অপব্যয় থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হন নি। আমার সেজদা কুমুদনাথ ছিলেন অতি রোখালো মেজাজের লোক। আমি যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, তিনি তখন থার্ড ইয়ারে পড়েন। তার সহপাঠী জনৈক গোবেচারি ছোকরা ক্লাসে বসে' পান চিবোচ্ছিল। অধ্যাপক ওয়েব সাহেব তাই দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছোকরাটিকে বাইরে গিয়ে মুখের পান ফেলে আসতে আদেশ করেন। সে যখন বেরিয়ে যায়, ওয়েব সাহেব তাঁর পিছন পিছন ছোটেন। সাহেবের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য সেজদাও সেই সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়েন। ওয়েব সাহেব প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করেন যে, সেজদা তাঁকে মারতে গিয়েছিলেন। তার বিচার হয়, ও তাতে সাব্যস্ত হয় যে, সেজদা বাস্তবিকই সাহেবকে মারতে যান। অবশ্য ঐ নিরীহ ছোকরাটির গায়ে সাহেব হাত দিলে সেজদাও আস্তিন গোটাতেন। এর ফলে এক বছরের জন্য সেজদা rusticated হ'ন। মেজদা (যোগেশচন্দ্র) তখন বাড়ীর কর্ত্তা, দাদা তখন বিলেতে, আর বাবা বিদেশে। মেজদা আমাদের সকলকে হুকুম দিলেন কৃষ্ণগর ফিরে যেতে। আমার

কলকাতা ছাড়তে বিশেষ আপত্তি ছিল। মেজদা বললেন, ও ছোকরা বখা ছেলেদের সঙ্গে মিশে বখে গেছে, তাই ও কলকাতা ছাড়তে চায় না। এ কথা শুনে আমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। আমি বল্লুম, আচ্ছা, আমি যাব।

আমরা পূজোর সময় কৃষ্ণনগর ফিরে গেলুম। গিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হলুম।

আমি কলকাতায় পঠদ্দশায় তুটি ব্যক্তির দর্শনলাভের সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করিনি। সেই তু'জনই ভবিষ্যতে আমার জীবন ও মন অধিকার করেন। একজন হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। বোধ হয় ১৮৮৪ খৃঃ সরস্বতী পূজোর দিন, হঠাৎ গরম পড়ায় আমি হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন থেকে হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণের মাঠে এসে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমার বন্ধু নারায়ণপ্রসাদ শীল সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন। তিনি আমাকে বল্লেন যে অ্যালবার্ট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি একটি বক্তৃতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর একটি বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। আর বল্লেন, 'চল না, রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা অ্যালবার্ট হলে যাই।' আমি তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম না, কারণ আমি শ্রান্ত বোধ করছিলুম। নারায়ণ বল্লেন, 'রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখে আসি চল। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী।' আমি উত্তর করলুম, 'পরের

বাড়ীর খুকি দেখবার লোভ আমার নেই।' ফলে অ্যালবার্ট হলে না গিয়ে নারায়ণ আর আমি সেই গাছতলাতেই শুয়ে থাকলুম। পরে সে মেয়েটিকেই আমি বিবাহ করি।

এর বছর দেড়েক পরে কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। কারণ ঐ ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবর কি নবেম্বর মাসে আমি কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করি। এবার কৃষ্ণনগর আমার বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এবং আমি সেচ্ছায় কলকাতা ত্যাগ করিনি বলে আমার মনও ভাল ছিল না। সময় কাটাবার জন্য আমি বাবার লাইব্রেরি থেকে নানারকম বই পড়তে শুরু করলুম। দুখানি বইয়ের কথা আজও মনে আছে: বাইরণের Don Juan আর ল্যাণ্ডরের Imaginary Conversations। আমার সেজদা কুমুদনাথ চৌধুরী শিকারে মত্ত হয়ে গেলেন। বন্দুক দিয়ে পাখীমারা-শিকারী সর্ব্বত্রই আছে। সুতরাং তাঁর সহশিকারীও জুটে গেল। কৃষ্ণনগরে বাঘ নেই, তাহলেও শ্রীবন নামে অঞ্জনার ধারে রাজার একটি অদ্ভুত বাড়ী ছিল; উচুঁতে পাঁচ-ছয় তলা, প্রতি তলায় একটি করে' ঘর, আর চারপাশে জঙ্গল। সেই জঙ্গলে সেজদা তাঁর শিকারী বন্ধুদের নিয়ে বাঘের তল্লাসে ঘুরে বেড়াতেন। আর মুসলমান চাষাদের অতিথি হয়ে চালের গুঁড়োর রুটি আর তেলে রান্না মুরগীর কারি খেতেন। আমি কৌতূহলবশত একদিন এই শিকার-অভিযানে যাই, রাজার হাতিতে চড়ে। সমস্ত দিন হাতির ঝাঁকুনি ও রোদ্দুরে আমি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে

পড়লুম। পরদিন আমার জ্বর হল, একেবারে ১০৫°। সেই জ্বর দিন আষ্টেক থাকে। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত “বালক” পত্রিকা পড়তুম। এ পত্রিকা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এর ভাষা অতি সহজ, এবং অতি চতুর ; আর রসিকতায় টগ্‌বগ্‌ করত। শ্রীমতী জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। অনেকগুলি ছোট খাটো প্রবন্ধ এই কাগজে প্রকাশিত হত। আমি পরে শুনেছি সে সবই রবীন্দ্রনাথের বেনামী লেখা।

জ্বর থেকে উঠে আমি বাবার কাছে দিনাজপুরে চলে যাই। এবং বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত সেখানেই থাকি। গ্রীষ্মকালে দিনাজপুর ভীষণ গরম। এই গরমের জন্যই হোক, কিম্বা অন্য কোন কারণে হোক্, আমার সেখানে ভয়ঙ্কর melancholia হয়। ইংরিজীতে যাকে বলে metaphysical troubles, আমার মনের ভিতর তা ছাড়া আর কিছু ছিল না। সেই সময় আমার সেজদা দিনাজপুরে আসেন। আমি বাবাকে বল্লুম, ‘এবার আমি ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিতে পারব না।’ তিনি তাতে কোন আপত্তি করলেন না। দিনাজপুরেও আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। জ্বর নয়, হজমের গোলমাল। বাবার কাছে হলধর নামে একটি হরিপুরের চাকর থাকত। তাকে তিনি ছেলেবেলা থেকে প্রতিপালন করেছিলেন। সে ছিল যৌবনে অতি বলশালী। কিন্তু দিনাজপুর গিয়ে দেখলুম কোন কাজ করে না। কেবল বসে বসে গুলি খায়। আমি

বাবাকে বলেছিলুম, ‘একে রাখেন কিসের জন্য ?’ তিনি বলেন, ‘বিদেশে একা থাকি, যদি কখনো অসুখ হয়, তাহলে হলধর আমার শুশ্রূষা করবে।’

আমি দেখলুম, একথা ঠিক। কারণ আমার অসুস্থ অবস্থায় হলধর আমার খাটের পাশে সকাল সন্ধ্যা বসে থাকত; এবং যখন যা ফাইফরমাস করতুম, সে কাজ করে' দিত। দিনাজপুরে আমরা যে বাসায় ছিলুম, সেটি শহর থেকে অনেক দূর। বাবা ছিলেন Land Acquisition Collector, তাই যে প্রকাণ্ড বাঙ্গলোটিতে আমরা ছিলুম, সেখানে তাঁর আপিসের আমলা-ফয়লা সকলে বাস করত; এবং ম্যাপ আঁকা প্রভৃতি কাজ করত। আমি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতুম। একবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমি দিনাজপুরের রাজবাড়ীতে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, সেকেলে রাজকায়দা সব বজায় আছে। ফটক থেকে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত মশালধারীরা আমাদের নিয়ে গেল। সেখানে নাচের আসর বসেছিল। তয়ফাওয়ালীদের দেখলুম একের পর আর একটিকে পান দিয়ে বিদায় করা হল। পান দেওয়ার অর্থ শুনলুম—ঢের হয়েছে, এখন সরে পড়। এর বহু পরে ঐ দিনাজপুরের রাজবাড়ীতে আবার যাই। দিনাজপুর অঞ্চল থেকে রাজা বাহাদুর অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহ করে' তাঁর বাড়ী সাজিয়েছেন। একটি স্তম্ভ সংগ্রহ করেছেন, যার উপর একটি খোদিত লিপি আছে।

আমি দিনাজপুরে অসুস্থ অবস্থায় ডিকেন্সের Martin

Chuzzlewit পড়ি। সে বইখানি আমার মোটেই ভালো লাগেনি। আমেরিকানদের কথায় কথায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ করার বিষয়টাই আমার কেবল মনে আছে। বাবার আপিসের হেডক্লার্ক্ কীর্ত্তন গাইতেন। একটি ব্রজবুলি গানের প্রথম ছত্র আমার আজও মনে আছে—

"এতেক মিনতি যব করলহ মাধব
তবু নাহি হেরিল বয়ান"।

এরই বাঙ্গলা অনুবাদ করে' তিনি গাইতেন। তা ছাড়া, বাবার কোন "পলি" চাকরের মুখে, কবি কালিদাসের ভাগ্নে-রচিত দুটি শ্লোক শুনি যা কহতব্য নয়।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি আমি ও সেজদা কৃষ্ণনগরে ফিরে আসি। দিনাজপুরের তুলনায় কৃষ্ণনগর দার্জ্জিলিং মনে হয়েছিল। যদিচ কৃষ্ণনগরও যথেষ্ট গরম। তবে সেখানে লু বইত না।

কৃষ্ণনগরে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কিন্তু মন প্রকৃতিস্থ হল না। দিনাজপুরের melancholia ও গ্রীষ্মের জের টেনে এনেছিলুম। আমার ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগর বোধ হয় তেমন গরম ছিল না। অন্তত'আমার কাছে অসহ্য মনে হয়নি।

এবার কৃষ্ণনগরে এসে দুপুরবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু কাঠঠোক্রার আওয়াজ শুনতুম। চাতকের "ফটিক জল" ডাক কখনো শুনিনি। তিন বৎসর কলকাতাবাসের পর কৃষ্ণ-

নাগরিক গ্রীষ্ম ঈষৎ কষ্টকর হয়েছিল। তখন ইস্কুল কলেজের গরমের ছুটি। আমাদের পিঠ পিঠ মেজদাদা (যোগেশ চৌধুরী) আমার ভগ্নী মৃণালিনী এবং ভাগ্নী প্রিয়ম্বদা, এঁরাও কলকাতা থেকে ছুটিতে কৃষ্ণনগর চলে এলেন। প্রিয়ম্বদার সঙ্গে স্নেহ আশ বলে' একটি মেয়ে ও কেশববাবুর সমাজের ভাই দীননাথের এক পুত্র এলেন। তিনি ছিলেন গাইয়ে। তাঁর গান শুনে আমরা মুগ্ধ হইনি। সে সব গানের যেমন কথা, তেমনি সুর। তার একটি গানের প্রথম লাইন আমার আজও মনে আছে, সেটি এই—

"নববিধানের কলের গাড়ি চলে যায়।"

এটি বোধ হয় নববিধানের সঙ্গীত।

এই সময় আমি কালিদাস বাগ্‌চী বলে' কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ী রাত্রে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে, যে ডাক্তার পূর্ব্বে আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সত্য লাহিড়ীর মুখে একটি গান শুনে চমকিত হয়ে উঠি। গানটি বাঙ্গলা, যথা—"বধু তুমি বলেছিলে তোমা বই আর কারো নই।" গানের সুরেরর নাম শুনলুম কানাড়া। এমন সুন্দর গান আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো শুনিনি। এ রাগ আজ পর্য্যন্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। এবং আমার বিশ্বাস যে হিন্দুসঙ্গীতের রাগরাগিণীর ভিতর কানাড়াই হচ্ছে রাজা। সত্য লাহিড়ী ছিলেন অতি সুগায়ক। তাঁর গলা ছিল যেমন মিষ্টি, তেমনি গতে পুরু।

পূর্ব্বে বলেছি যে, আমি ছেলেবেলায় একটি যুবকের মুখে পিলু রাগিণীর একটি গান শুনি, যেটি আমার চমৎকার লেগেছিল। আমার বিশ্বাস সেটি আমি এই সত্য লাহিড়ীর মুখেই শুনি। তিনি ছিলেন দাদার সহপাঠী, আমার চাইতে অনেক বড়। ইতিমধ্যে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করেন। ফলে তিনি পুরো ওস্তাদ না হলেও একরকম হাফ-ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন। আমি এই সময় থেকেই তাঁর মহাভক্ত হয়ে উঠি। যদিচ চরিত্রবান বলে' তাঁর সুনাম ছিল না।

এই গান শুনে আমার melancholia কেটে যায়, ও আমি দুটি অল্পবয়সের ছোকরা, যারা গাইতে পারে, তাদের আমাদের বাড়ীতে এনে রাখি এবং তাদের ভরণপোষণের ভার নিই। এমন কি, তাদের ইস্কুলের মাইনে পর্য্যন্ত আমি দিতুম। এর জন্য মাস্টার মশায় কোন আপত্তি করেন নি। কারণ তারা উভয়েই ছিল তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়। সতীশ বলে' ছোকরাটির গলা ভারী মিষ্টি ছিল। কিন্তু সে গলা টেকসই নয়। একটু বয়স হলেই সে গলার মাধুর্য্য যে নষ্ট হবে, তা আমি তখনই বুঝেছিলুন।

তারা আমার ছোট ভাই অমিয়র সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। বহুকাল পরে শুনেছি যে, এ দুজন অমিয়র কাছে কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্যের প্রার্থী হয়ে এসেছিল। এর থেকে অনুমান করছি যে, তারা না-লেখাপড়া, না-সঙ্গীত—কোন বিষয়ই লাভ করেনি।

আমি কৃষ্ণনগর কলেজে সেকেণ্ড্ ইয়ার ক্লাসে আবার ভর্ত্তি হলুম। তখন সে কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ম্যান্ সাহেব। তিনিই আমাদের ইংরিজী পড়াতেন। কিরকম পড়াতেন, তা আমি বলতে পারিনে। আমি প্রফেসরদের কথায় বড় একটা মনোযোগ দিতুম না। অপরিচিত সহপাঠী-দের সঙ্গে ক্লাসে গল্পস্বল্পও করতুম না। এক কোণে চুপ চাপ করে বসে থাকতুম। নকুলেশ্বর পণ্ডিত আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাঁর পঠন-পাঠনের ভিতর কোন রসকস ছিল না। অপর মাস্টার কে কে ছিলেন আমার মনে নেই। ফিজিক্স-এর প্রফেসর ছিলেন অতিশয় ভদ্র ও মিষ্টভাষী। কিন্তু আমি দু-চার দিনেই আবিষ্কার করলুম যে, ফিজিক্স সম্বন্ধে তাঁর চাইতে আমার জ্ঞান পরিষ্কার। সে কথা তাঁকে বলতেও আমি আমি ত্রুটি করিনি। তিনি ছিলেন নদে জেলার কোন বিশিষ্ট জমিদার বংশের ছেলে এবং অতি সদাশয় লোক। ছোক্‌রা বয়সে হয়েছিলেন ঘোর ব্রাহ্ম।

আমি প্রথম থেকেই প্রিন্সিপাল ম্যান্ সাহেবের সুনজরে পড়ি, এবং তাঁর অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠি—যার পরিচয় আমি পরে পাই। কলকাতা থেকে চলে এসে দলছাড়া হয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলুম না, তাই আমি ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মেলাবেশা না ক'রে পূর্ব্বোক্ত সত্য লাহিড়ীর গানের আড্ডায় যোগ দিলুম। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম রামতনু

লাহিড়ীর ভাই কালী লাহিড়ী ছিলেন কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার; সত্য ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। এবার কৃষ্ণনগর ফিরে গিয়ে দেখি সত্যও হয়েছেন একজন ডাক্তার—ইস্কুল কলেজে পড়ে' নয়, তাঁর পিতার কাছে শিখে। তিনিও হয়ে উঠেছিলেন একটি খুব ভাল চিকিৎসক। তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং রোগ সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর সহায় হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর ডিস্পেন্সারিতে জনকতক যুবক গিয়ে জুটত; তাদের মধ্যে কেউ বেকার, কেউ বা গবর্নমেণ্টের ছোটখাটো চাক্‌রি করে। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন না কোন যন্ত্রে হাত লাগাত, যথা—সেতার, বেয়ালা, বাঁয়া তবলা, ঢোলক ইত্যাদি। একমাত্র সত্যই সব যন্ত্র বাজাতেন। এ ছাড়া কৃষ্ণনগরে শশী কর্ম্মকার বলে একটি ওস্তাদের আবির্ভাব হয়; তাঁর বাড়ী কৃষ্ণনগরের পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। তিনি পূর্ব্বে কলকাতায় হ্যামিল্টনের দোকানে হুলিবুলির কাজ করতেন। সেই সময় বিখ্যাত গায়ক নুলো গোপালের নিকট তিনি গান শেখেন। নুলো গোপালকে বৃদ্ধ বয়সে আমি দেখেছি। তখন তাঁর গলা দিয়া আওয়াজ বেরোত না। তিমি আমার এবং আমার খুড়শ্বশুর মহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে ফিস্‌ ফিস্‌ করে' একটি গান গাইলেন। আমি শুনে অবাক হয়ে গেলুম। কি মিষ্টি তাঁর তার। কি দরদী তার মিড়। আর বুঝলুম যে এঁর যখন গলা ছিল, তখন ইনি একটি অসাধারণ গাইয়ে ছিলেন। শশী কর্ম্মকার এহেন ওস্তাদের

কাছে শিক্ষা পেয়ে যে একটি ভাল গাইয়ে হয়ে উঠেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি ছাড়া বিদ্যাসুন্দরের গান অতি-চমৎকার গাইতেন। এর পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে বদ্রি সুকুল নামে একটি হিন্দুস্থানী ওস্তাদ ছিলেন। তিনি নাবালক রাজাকে সেতার এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। সত্য লাহিড়ী প্রথম প্রথম সেই বদ্রি সুকুলের কাছে সেতার ও গান শেখেন।

এঁদের দলে মিশে আমার সঙ্গীতের নেশা হয়। সে নেশা এখনো সম্পূর্ণ ছোটেনি।

এ অবস্থায় এবার কৃষ্ণনগরে আমি যে বিশেষ কিছু লেখাপড়া করতুম, তা নয়। এমন কি নতুন পাঠ্য পুস্তকও আমি কিনিনি। কলেজ খোলা থাকলে দশটায় সেখানে একবার যেতুম, আর চারটের পর ফিরে আসতুম। তারপর পাঁচটা আন্দাজ সত্য লাহিড়ীর ডিস্পেনসারিতে যেতুম, এবং ঘণ্টাখানেক সেখানে হয় গান বাজনা শুনে, নয় গল্পস্বল্প করে সাড়ে সাতটার পর বাড়ী চলে আসতুম। এই বাড়ী ফেরার পথটা একটু অদ্ভুত ছিল। রাস্তায় জনমানব কখনো দেখিনি; আর দু পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেগুন গাছ ছিল, তাই অন্ধকারের ভিতর সেই পথ দিয়ে ফিরতে হত! একদিন পথে ভূতের ভয় পাই। সেই নির্জ্জন রাস্তায় হঠাৎ সেই সেগুন গাছের তলা থেকে একটি বিকট হাসির আওয়াজ পেলুম। মনে করলুম, এ হাসি কোন মানুষের হাসি কি না, সেটা না জেনে

ভয়ে আর অগ্রসর হতে পারব না। তাই প্রতি সেগুন গাছের গায়ে ছড়ি দিয়ে মারতে মারতে দু-চার পা করে এগোতে লাগলুম। হঠাৎ একটি মহা চীৎকার শুনলুম। আমি একটু এগিয়ে দেখি একটি গাছের তলায় এক পাগলী দাঁড়িয়ে আছে ; সে আমার পূর্ব্বপরিচিতা। তখন আমার ভয় কেটে গেল। এ ছাড়া মধ্যে মধ্যে রাস্তার ধারে যেখানে বড় গাছ কম, সেখানে ছোট গাছে শাঁখচুন্নী দেখেছি। প্রথম শাঁখচুন্নী দেখি, একটি শেওড়া গাছের ডালে পা দিয়ে সাদা কাপড়পরা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। সেবারও আমি ছড়ি দিয়ে সেই স্ত্রীলোককে আঘাত করি। তাতে আবিষ্কার করি যে, গাছের গায়ে চাঁদের আলো পড়ে এই শাঁখচুন্নীর রূপ ধারণ করেছে।

সত্যবাবুর ডিস্পেন্সারি থেকে আমাদের বাড়ী প্রায় আড়াই মাইল দূরে, আর এর বেশির ভাগ পথ সেগুন গাছের বীথির ভিতর দিয়ে যেতে আসতে হত ; সন্ধ্যার পর ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। তবু সঙ্গীত অথবা আড্ডার এমনি নেশা যে, আমার উক্ত আড্ডায় হাজির হওয়া নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হয়ে উঠেছিল।

আমার কলেজের পড়াশুনায় মন ছিল না। শেষটা ডিসেম্বর মাসে আমি পরীক্ষার পড়া পড়তে আরম্ভ করি, ও ফেব্রুয়ারী মাসে টেস্ট পরীক্ষা দিই। তার ফল থেকে আমি অনুমান করেছিলুম যে, আমি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হব। তার কিছুদিন পরেই ৩রা মার্চ্চ ১৮৮৬ সালে আমার

দাদা আশু চৌধুরী পাঁচ বৎসর পর বিলেত থেকে ফিরে এলেন। সেই দিনই আমার পায়ে অল্প অল্প ব্যথা হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভাগমে বাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। সুতরাং আমার পায়ের ব্যথার কোন তদ্বির করা হল না। দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যে সে ব্যথা সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল; এবং জ্বর উঠল ১০৫°। শুনলুম আমার যা হয়েছে তার নাম নাকি rheumatic fever। আমি একুশ দিন অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে রইলুম। একুশ দিনের পর আমার জ্বর ছাড়ল এবং ব্যথা কমতে আরম্ভ করল। সে বৎসর তাই আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না।

রোগমুক্ত হবার কিছু দিন পর আমি আমাদের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দর্শন লাভ করি। দাদা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক জাহাজে বিলেত যাত্রা করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে দাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে কৃষ্ণনগরে আসেন। প্রথম দর্শনে রবীন্দ্রনাথ আমার মনে কিরকম গভীর ছাপ অঙ্কিত করেছিলেন, সে কথা আমি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র বলেছি। এ স্থলে তার পুনরাবৃত্তি করব না। সে সময় আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখি, ও তাঁর কথাবার্ত্তা এবং গান শুনি। আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে দক্ষিণে একটি লম্বা চওড়া ঢাকা বারান্দা ছিল এবং তার দক্ষিণে একটি মাঝারি গোছের খোলা বারান্দা ছিল।

একদিন সন্ধ্যার পর সেখানে দাদা ও রবীন্দ্রনাথ বসে তাল সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে আসবার কিছু পূর্ব্বে কলকাতায়, বোধ হয় মেডিক্যাল কলেজে, তাল সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। আমি ঢাকা বারান্দায় অন্ধকারের ভিতর বসে তাঁদের আলোচনা শুনছিলুম। শুনে দাদাকে একটি প্রশ্ন করলুম। সেই রাত্রে দাদার মুখে শুনি যে, আমার প্রশ্ন শুনে রবীন্দ্রনাথ দাদাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ প্রশ্ন কে করলে?" দাদা বলেন, "আমার একটি ছোট ভাই।" রবীন্দ্রনাথ নাকি দাদাকে বলেন, "তোমার ও ভাইটি দেখছি অতি বুদ্ধিমান ও চতুর। আমার সে প্রশ্নটি ছিল এই যে—রাস্তা দিয়ে একটি ঘোড়া যদি সমান জোরে দৌড়ে যায়, তবে তার সমপদবিপক্ষের শব্দ কি কানে মিষ্টি লাগে না?—যদিচ তার ভিতর কোন স্বরস্বর নেই, আছে শুধু সমান সময় ব্যবধান।— তিনি কৃষ্ণনগরের মত পাড়াগাঁয়ে এসে, একটি রুগ্ন ছোকরার মুখে এরকম প্রশ্ন বোধ হয় প্রত্যাশা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, আমি প্রথমেই আবিষ্কার করি তিনি দেহে ও মনে একটি লোকোত্তর পুরুষ।

এর মাসখানেক পরে আমি দাদার সঙ্গে আবার কলকাতায় পড়তে ফিরে আসি। সেকালে একবার পরীক্ষা না দিলে কলেজে মাত্র ছ' মাস পড়তে হত। আমি মট্‌স্ লেনে একটি বাসায় থাকতুম। কিন্তু কলেজে যেতুম না। ছ' মাসের জন্যে St. Xavier's College-এ ভর্ত্তি হই! তখন তার

কলেজ ক্লাস হত লালবাজারের একটি বাড়ীতে। তার মালীর ঘর অর্থাৎ জলখাবার ঘরে দস্তুরমত আড্ডা বসত। ছাত্রদের ভিতর কেউ কেউ বাইরে থেকে বীয়ার আনিয়ে পান করত।

এই সময় আমার সঙ্গে নতুন কতকগুলি ছাত্রের পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধিমান ছোক্‌রা ছিল। যথা:—সতীশ মুখুজ্যে ও তুলসী মুখুজ্যে। সতীশ বার্ম্মায় গিয়ে ম্যাণ্ডালেতে বড় উকিল হন; কিন্তু অল্প বয়সেই মদ খেয়ে মারা যান। আর তুলসী পাঠ্যপুস্তক লিখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইংরিজী ভাষা তিনি ভালই জানতেন। তিনিও শুনেছি সুরার কবলে প্রাণত্যাগ করেন। যারা স্কুল-কলেজে পড়ে না, এমন কোন কোন ছোকরাও সেখানে আড্ডা দিতে আসত। কিন্তু তারা মদ্যপান করত না। তাদের মধ্যে একটি সোনার বেণে ছেলেকে দেখেছি, যিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। এবং তাঁর মুখেই শুনেছি, যে সব স্ত্রীলোক সমাজ-বহির্ভূত—তিনি তাদের সেই কবিতা পড়ে শোনাতেন ও মুখস্থ করাতেন।

আমি St. Xavier's থেকে এফ্. এ. দিই, ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই।

আমি যে এবার পরীক্ষায় এক ধাপ নেবে যাই, তার কারণ দু-দু বার রোগাক্রান্ত হয়ে আমি পরীক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছিলুম। ইস্কুলের লেখাপড়ায় আমার মন লাগত না। তা ছাড়া rheumatic fever-এর প্রসাদে আমার

শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। ডাক্তার বাবুরা ভয় দেখিয়েছিলেন যে, উক্ত রোগে যদি আমার হৃদ্‌যন্ত্র বিগড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার আর কোন চিকিৎসা নেই। এবং আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আমি যেন কোনরকম exercise না করি। আমি এর পূর্ব্বে ফুটবল খেলতুম। আমি এবং আমার ভাই মন্মথ বোধ হয় প্রথম বাঙ্গালী ছেলে যারা ফুটবলে পদাঘাত করে। মন্মথ অক্সফোর্ড মিশনের ব্রাউন সাহেবের কাছে ফুটবল খেলা শিখেছিল। মন্মথর ছিল শরীরের গড়ন চমৎকার ও বলিষ্ঠ। ভয়ডর কাকে বলে সে জানত না। আমার বন্ধু নারায়ণ শীলের কাকা হরিদাস শীল একদিন আমাদের কাছে প্রস্তাব করেন যে, এস আমরা সকলে মিলে ফুটবল খেলা শুরু করি। এবং তিনি নিজের ব্যয়ে একটি ফুটবল কিনে আমাদের দেন। মন্মথ ফুটবল খেলার নিয়মকানুন সব জানত। সে-ই আমাদের ফুটবল খেলা শেখায়। মন্মথ আর আমি, আমরা দুটি পাড়াগাঁয়ে ছেলে forward খেলতুম। ধাক্কাধুক্কি খাওয়ায় আমরা ভয় পেতুম না। আমি কস্মিনকালে কোন খেলাতে ভাল ছিলুম না। কিন্তু আমার এই ফুটবল খেলার নেশা হয়। ক্রমে ক্রমে আরও পাঁচজন ছেলে ফুটবল খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। লালচাঁদ বড়ালও এই খেলোয়াড়দের ভিতর একজন ছিল। এদের ভিতর একটি ছোকরাকে আমি বহুকাল পরে দেখি। তখন তিনি সেক্রেট্যারিয়েটে কাজ করেন। আর তাঁর প্রায় পেন্সন

নেবার বয়স হয়েছে। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি নিজ ব্যয়ে শিবপুরে একটি ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর অল্প বয়সের এই সখ চিরজীবনের প্রধান সখ হয়ে উঠেছিল। আমাদের ভিতর অবশ্য আমার ভাই মন্মথ পয়লা নম্বরের ফুটবল-খেলিয়ে হয়ে ওঠেন। গোরাদের সঙ্গে ম্যাচ্ খেলতে গিয়ে তাঁর একটি পা জখম হয়।

আমি এই অসুখের পর ফুটবল খেলা ছেড়ে দিলুম। খেলাধুলো করিনে, ইস্কুল-কলেজের বইও পড়িনে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে দিন যাপন করা কষ্টকর হয়ে উঠল। দাদা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে অনেক ফরাসী বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, 'তুমি ঘরে চুপচাপ করে বসে থাক, ফরাসী শেখ না কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করব।'—সেই থেকে আমার ফরাসী বই পড়ার অভ্যাস হয়ে গেল। দাদার সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমার জীবন ও মনের মোড় ফিরে গেল। দাদা যে-সব নতুন লেখকের বই নিয়ে এসেছিলেন, আমি পূর্ব্বে কখনো তাদের নাম শুনিনি,—যথা, রসেটি ও সুইনবার্ণ প্রভৃতির কবিতা। আর ছবি সম্বন্ধে pre-Raphaelite art-এর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। দাদার বাড়ীর আবহাওয়া aesthetic ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যহই আমাদের মট্‌স্ লেনের বাসায় শুভাগমন করতেন। সঙ্গে থাকতেন তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী। আমার যত দূর মনে পড়ে সত্যপ্রসাদ হারমোনিয়মে রবীন্দ্রনাথের

গানের সঙ্গীত করতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে অভিজ্ঞা নামে একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এমন চমৎকার গাইয়ে মেয়ে আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখিনি। তার গলা ছিল সুমিষ্ট ও দরদী, আর সে অভিনয় করত অতি সুন্দর। আমি তাকে বাল্মীকি প্রতিভার প্রথম গান থেকে আরম্ভ করে শেষ গান পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে এককালীন বসে গাইতে শুনেছি। বাল্মীকি প্রতিভা গীতি-নাট্য। তার গানের রূপ ফুটিয়ে তুলতে অভিনয়ের আবশ্যক। ও নাটকের সমস্ত গানগুলি গাওয়াই অত্যন্ত কঠিন; কারণ তাতে দেশী বিলেতী নানারূপ সুর আছে, দেশী গান ভারি ভারি রাগেরও আছে, এবং দেশী বিলেতী প্রত্যেক সুরটি বিভিন্নরকম অভিনয়ের অপেক্ষা রাখে। বাল্মীকি প্রতিভার গান অভিজ্ঞার মত মর্ম্মস্পর্শী করে গাইতে আমি আর কাউকে কখনো শুনিনি। সঙ্গীতের বিষয় তার কিছু শিক্ষাও ছিল; সে কোন কোন হিন্দী গানও অতি দরদ দিয়ে গাইত। "ঠারি রহো মেরে আঁখন আগে" বলে অভিজ্ঞার গীত একটি ছায়ানটের গান আজও আমার কানে লেগে আছে। অভির সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, তখন তার বয়স বছর তেরো হবে। দেহ বলে তার কোনো জিনিস ছিল না। মুখের মধ্যে দু'টি বড় বড় জীবন্ত চোখ ছিল। আর সে চোখ দু'টি মাধুর্য্যপূর্ণ। সে ছিল শেক্সপীয়রের কল্পিত আরিয়েলের সগোত্র। অর্থাৎ অশরীরী সঙ্গীত। সে মেয়েটি বিবাহিত হবার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। অবশ্য পরে তার বিবাহ হয়েছিল, আমার

বিলেতে পরিচিত কোন যুবকের সঙ্গে। আমি শুনেছি যে, বিবাহের এক মাসের মধ্যেই সে ক্ষয়কাশে মারা যায়। এ খবর যখন পাই, তখন আমি বিলেতে ছিলুম। শুনে আমার মনে হল বাঙ্গলা দেশের একটি রত্নপ্রদীপ অকালে নিভে গেল। আমি অভিজ্ঞার বিষয় এত কথা লিখছি এই কারণে যে, জীবনে কোন কোন লোক প্রথম থেকেই আমাদের মনে বিশেষ ছাপ রেখে যায়, যা কখনো বিলুপ্ত হয় না। অভি ছিল সেই দু-চারটি লোকের ভিতর একজন। ইংরেজরা বলে Whom the gods love die young। অভি ছিল সেই দেবানাং প্রিয় একটি বালিকা। কেন-না, সে কখনো কিশোরী হয় নি। এরই বড়দিদি প্রতিভা দেবীকে আমার দাদা বিবাহ করেন।

সেকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ছিল একটি সঙ্গীত-ভবন। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে পড়েছি যে, এককালে তাঁদের বাড়ীতে বড় বড় সব ওস্তাদ অধিষ্ঠান করতেন, যেমন—যদু ভট্ট। কিন্তু আমি তাঁদের দেখিনি। আমার যখন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয় তখন বিষ্ণু নামক একটি বৃদ্ধ ওস্তাদ প্রতিভা দেবীদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। আমার ধারণা তিনি খুব ভাল গাইতেন। তাঁর গানে তানের বাহুল্য ছিল না। অথচ রাগরাগিণী, সুর, ও তালের উপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। আমি পূর্ব্বে যে হিন্দি গানটির উল্লেখ করেছি, সেটি বিষ্ণুর গান। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের স্বরচিত গান বাড়ীর অনেক ছেলেমেয়ে গাইত।

এবং মন্দ গাইত না। দিনেন্দ্রনাথ তখন বালক ছিলেন। তিনি যে পরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সে এই আবহাওয়ার গুণে। রবীন্দ্রনাথকে আমি কখনো কোন যন্ত্র বাজাতে দেখিনি। তিনি চর্চ্চা করেছিলেন একমাত্র কণ্ঠসঙ্গীত। আমরা অবশ্য জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে থাকতুম না, থাকতুম মট্‌স্ লেনে একটি ছোট বাসাবাড়ীতে। কিন্তু দাদার বিবাহ সম্বন্ধ হবার পর থেকে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ হয়। এর একটি কারণ বোধ হয় আমরা ব্রাহ্ম না হলেও reformed Hindus ছিলুম। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের বিধি-নিষেধ আমরা উপেক্ষা করতুম। এবং আমরা ভাইরা সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষিত ছিলুম।

এই ঘনিষ্ঠতার ফলে ঠাকুর পরিবারের ঐকান্তিক সঙ্গীত-চর্চ্চার প্রভাব থেকে আমি মুক্ত ছিলুম না। তাঁদের সঙ্গীতের দুটি ধারা,—একটি ক্ল্যাসিকাল আর একটি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়;—দু'টিই পাশাপাশি চলত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার যে মার্গসঙ্গীতের প্রকৃষ্ট চর্চ্চা করতেন, তার প্রমাণ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের আদি ব্রাহ্মসঙ্গীতে পাওয়া যায়। আমি ছেলেবেলা থেকে এর কতকগুলি গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলুম। সে গানগুলি বাঙ্গলা দেশের গাইয়ে-বাজিয়েদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল, যথা: গাও হে তাঁহার নাম, খাম্বাজ-চৌতাল; অচল ঘন গহন, বাহার-চৌতাল; দেখিলে তোমার সেই, বাহার-একতালা; তুমি হে ভরসা মম, কাফি-ঝাঁপতাল ইত্যাদি।

হয়ত পূর্ব্বে একথার আমি উল্লেখ করেছি; কিন্তু তার পুনরুক্তি করায় ক্ষতি নেই। হিন্দি গান বাঙ্গলায় প্রথম এঁরাই ভাঙ্গেন। পরে শুনেছি "গাও হে" এবং "দেখিলে তোমার" গান দু'টি গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, "অচল ঘন" বিষ্ণু ওস্তাদের, এবং "তুমি হে ভরসা" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত। আমি এ সব গানের তালের উল্লেখ করেছি। যদিচ আমি তালের কোন ধার ধারিনে। তবে চৌতাল শুনলে বুঝতে পারি যে তার বোল "ভেটকি মাছের তিনখানা কাঁটা" নয়।

রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের গান অধিকাংশই পিলু বারোয়াঁ জাতের ছিল, এবং তার তাল ছিল বিলম্বিত নয়,—নাচুনে। আমার কান বাঙ্গালীর স্বকৃতভঙ্গ মার্গসঙ্গীতে অভ্যস্ত ছিল, যাতে সুরের রূপ বজায় থাকত; তানকর্ত্তবে ঢাকা পড়ত না। তাই কৃষ্ণনগরের মহারাজার সেতার-শিক্ষক বদ্রি সুকুলকে খুঁজে বা'র করলুম। তিনি শ্যাম ক্ষেত্রী নামক একটি যুবকের সঙ্গে রূপচাঁদ রায় স্ট্রীটে বাস করতেন। উভয়েই ডন মুগুর ও কুস্তি করতেন, আর অবসরমত সেতার বাজাতেন। সেকালে সঙ্গীত আমাকে বিশেষরকম বিচলিত করত। আমাদের বাসায় একদিন সকাল বেলা বদ্রি সুকুল ভৈরবী বাজান, তা শুনে আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। এই সুকুলজী পরে ঠাকুর পরিবারের কোন কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গীত-শিক্ষক হ'ন। তিনি ছিলেন ঘোর হিন্দু, পয়লা নম্বরের পালোয়ান এবং অতি সচ্চরিত্র। এর থেকে

বুঝতে পারা যাবে যে, আমার কৃষ্ণনাগরিক সঙ্গীত-প্রীতির মায়া একেবারে কাটে নি। সে যাই হোক, ঠাকুর পরিবারের aesthetic আবহাওয়া নিশ্চয়ই অলক্ষিতে আমার সঙ্গীত-চর্চ্চার কান্তি পুষ্ট করেছিল। অপর পক্ষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতি অনুকূল ছিলেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র আমি খুব তারিফ করেছি। ও নাটিকার কথা সুর ও অভিনয় সবই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাপ্রসূত। এবং শ্রীমতী অভিজ্ঞা ছিল ললিতকলায় তাঁর অগ্রগণ্য শিষ্যা। পূর্ব্বেই বলেছি যে, রূপজ্ঞানে আমি বর্জ্জিত ছিলুম না। যে-রূপ চোখে দেখা যায়, সে-রূপের আমি চিরকালই অনুরাগী ছিলুম। এবং এই ঠাকুর পরিবারের তুল্য সুন্দর স্ত্রী-পুরুষ আমি অন্য কোন পরিবারে দেখিনি। যে-রূপ শ্রোত্ররসায়ন, সে রূপেরও এঁরা সম্যক চর্চ্চা করতেন। বাকি থাক্‌ল এক কাব্যের কথা। সে কথা পরে বলব।

. . .

পূর্ব্বে বলেছি আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেই বই-পড়িয়ে লোক ছিলেন। বাবা সেকালের হিন্দু কলেজে শিক্ষিত। সংস্কৃত তিনি এক বর্ণও জানতেন না, ও বাঙ্গলা সাহিত্যকে তিনি একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখতেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরাও সকলেই ইংরেজীনবিস ছিলেন। আমি ছেলেবেলায় তাঁদের যে কথোপকথন শুনেছি, তার থেকে আমার ধারণা তাঁরা সকলেই বাইরণের ভক্ত ছিলেন। আর শেক্স্‌পীয়র

তাঁরা সকলেই জানতেন। বাইরণ যে তাঁদের এত প্রিয় ছিল, তার কারণ তিনি স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন। আমার বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর, তখন বাঙ্গলা দেশের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর patriotism-এর জোয়ার বইতে আরম্ভ করেছে। তাঁরা পলিটিক্সের কোন ধার ধারতেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ যে পরাধীন, এ অবস্থায় তাঁদের মনকে অত্যন্ত পীড়া দিত। আর আমাদের ছোট ছেলেদেরও—

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়—

রঙ্গলালের কবিতার এই ছত্রটি মুখস্থ করতে হত। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, আমরা যাকে কাব্য বলি, তা শুধু শেক্সপীয়রেই পাওয়া যায়। আমার যখন সাত-আট বৎসর বয়স, তখন আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবরা জন স্টুয়ার্ট মিল্-এর মহাভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রায়ই তাঁদের মুখে মিলের নাম শুনতুম। অবশ্য তাঁরা মিলের Logic Economics কেউ পড়েন নি। তাঁরা পড়তেন শুধু Three Essays on Religion আর Subjection of Women। এমার্সন--এর নামও তাঁদের মুখে শুনেছি। আমি অল্প বয়সে এই মিল্ ও এমার্সন-এর নাম শুনে শুনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম। তার পরে অদ্যাবধি আমি এ দুই লেখকের একখানি বইও পড়িনি। দাদারা নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" ও বঙ্কিমের প্রথম

যুগের নভেল সব পড়তেন। আজও আমার বেশ মনে আছে যে, আমার যখন আট বৎসর বয়স, আমি তখন প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাম শুনি। রবীন্দ্রনাথ তখন "জ্ঞানাঙ্কুর" কি ঐ রকম একটা কাগজে কবিতা প্রকাশ করতেন। এবং রবি ঠাকুর কবি কি না, দাদা ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সে বিষয় আলোচনা করতে শুনেছি।

তারপর রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য আমরা দেখিওনি, পড়িওনি। আমার বয়স যখন চৌদ্দ, তখন আমি হেয়ার স্কুলের কোন সহপাঠীর অনুরোধে 'ভগ্নহৃদয়' একটু পড়ি। পড়ে' যে খুব উল্লসিত হয়ে উঠি, তা বলতে পারিনে। সত্য কথা বলতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পরেই আমি তাঁর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মট্‌স্ লেনের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন দাদার সঙ্গে তাঁর "কড়ি ও কোমল" প্রকাশের পরামর্শ করতে। দাদাই ঐ কবিতাপুস্তক প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন। বইটি ছাপা হবার পূর্ব্বে তিনি কবিতাগুলি দাদাকে পড়ে' শোনাতেন, সে ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকতুম। কবিতা বস্তুটি কি, সে বিষয়ে তাঁদের আলোচনা শুনতুম। তার থেকেই আমার ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি আছে, যা হেম-নবীনের ছিল না। এই আলোচনার ফলে কবিতা সম্বন্ধে আমার মন যেন জেগে উঠল। তিনি কবে কি বলেছেন, তা অবশ্য আমার মনে নেই। তবে যেমন তিনি আমাদের পরিবারে

সঙ্গীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি তিনি আমাদের মধ্যে কাব্যচর্চ্চারও আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, এই পর্য্যন্ত বলতে পারি। খুব সম্ভবত আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি।

এই সময় আমি একটি নতুন সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হই। দাদার সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও লোকেন্দ্রনাথ পালিত বিলেত থেকে ফিরে আসেন। এঁরা সকলেই বিলেতে দাদার সমসাময়িক ছিলেন। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে আমি প্রথম দেখি কৃষ্ণনগরে। রাজবাড়ীর পূর্ব্ব-দিকে সুকুল পাড়া নামে একটি পাড়া আছে, সেখানে সব হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের বাস;—যারা একরকম বাঙ্গালী হয়ে গেছে। আমি দাদার সঙ্গে পরেশ 'সুকুল বলে' একটি ভদ্র-লোকের বাড়ী যাই, এবং সেখানেই প্রথম ব্যোমকেশকে দেখি। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেঠতুতো ভাই রাজেশ্বর বাবুর কন্যা মোহিতকে বিবাহ করেন। তাকে দেখে আমি একটু চম্‌কে যাই। অতি সুন্দর পুরুষ, নাক চোখ মুখ সব কুঁদে কাটা, আর কথাবার্ত্তায় ফুর্ত্তিতে টগ্‌বগ্‌ করছেন। যদিচ তিনি আমাদের স্বজাত, তবু প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে তেমন মেলামেশা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে তিনি আমাদের পরিবারের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আমাদের বাসায় মধ্যে মধ্যে আসতেন। এবং সেই থেকে তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলুম। তিনি ছিলেন অতিশয় অমায়িক লোক এবং

যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি নিজ গুণে কলিকাতা হাইকোর্টে সব চাইতে বড় ব্যারিস্টার হয়ে ওঠেন, এবং শেষে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ফরাসী ভাষা ভালই জানতেন এবং অসংখ্য ফরাসী নভেল পড়তেন। সুতরাং সাহিত্যরসে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না।

লোকেন পালিত ছিলেন I. C. S., আর দিবারাত্র সাহিত্যালোচনা করতেন। এ বিষয় তাঁর মুখে খই ফুটত। আমি অবশ্য তাঁর বইপড়া মতামত সব সময় গ্রাহ্য করতে পারতুম না। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহা ভক্ত। তিনি স্বনামধন্য ব্যারিস্টার টি. পালিতের পুত্র। পালিত পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের বহুকালের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলেত যান, তখন ছোক্‌রা লোকেন পালিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন যে, লোকেন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও কইয়ে-বলিয়ে ছোকরা।

এই নব-বিলাতফেরতের দল সকলেই ছিলেন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক। ব্যোমকেশ ছিলেন বিজ্ঞানে শিক্ষিত। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন আইনে অসাধারণ পারদর্শী। লোকেন পালিত ছিলেন সাহিত্যে অভিজ্ঞ। আমি এর পূর্ব্বে সেকালের জনকতক বিলেত-ফেরতকে চিনতুম, যথা ঃ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, তাঁর ভ্রাতা লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যে ও কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। কিন্তু তাঁরা ছিলেন আমার

অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। এই নতুন-বিলেতফেরৎ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যেমন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তার পূর্ব্ববর্ত্তীদের সঙ্গে তেমন হয়নি। যদিচ তাঁরা সকলেই আমাদের প্রতি অনুকূল ছিলেন।

এঁদের দলে পড়ে' আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছিল; যথা—টেবিলে ছুরিকাঁটায় খাওয়া, মুসলমান বাবুর্চ্চি রাখা ইত্যাদি। আমরা সব ভাই-ই হয়ে উঠেছিলুম প্রায় আধা-বিলেতফেরৎ, যদিচ আমরা বিলাতী পোষাক পরতুম না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা যেমন reformed Hindus ছিলুম, তেমনি reformed স্বদেশী হয়ে উঠেছিলুম। অর্থাৎ হিন্দুয়ানী ও স্বদেশভক্তির ভিতের উপর আমাদের মনের চরিত্র গড়ে' উঠেছিল।

এখানে একটি গল্প বলি। আমি যেদিন সন্ধ্যায় লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছোই, তার পরের দিনই Inner Temple-এ ভর্ত্তি হই, আর সেই দিন সন্ধ্যাবেলায়ই সেখানে dinner খেতে যাই। Temple-এ এক এক term-এর ভিতর অন্তত ছ'দিন dinner না খেলে সে term রক্ষা করা হয় না। আমি গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড খানা-কামরা লোকে ভরতি। একটি টেবিলে এক বাঙ্গালী ছোকরা বসেছিলেন, তাঁর পাশের চেয়ার খালি দেখে আমি সেই চেয়ারে বসে পড়লুম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—

—আপনি বাঙ্গালী?

—হাঁ।

—বিলেতে এলেন কবে?

—গতকল্য।

—আমি আপনাকে ছুরিকাঁটা ব্যবহার করতে শেখাই।

—আচ্ছা।

এর পর তিনি আমাকে শেখাতে লাগলেন যে ডান হাতে ধরতে হয় ছুরি, আর বাঁ হাতে কাঁটা। আর কোন্ কাঁটা-ছুরিতে মাছ খেতে হয়, তাও দেখালেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম। তারপরে প্রথমে যখন সুরুয়া এল, ভিতরে খোঁদলকরা প্লেটে, তখন তিনি সে প্লেটটি বুকের দিকে হেলিয়ে চামচ দিয়ে সূপ তুলে খেতে লাগলেন। আমি তাঁকে বল্লুম—"এ প্লেটটি উল্টো দিকে হেলাতে হয়।" তিনি বল্লেন—"আপনি আমাকে শেখাতে এসেছেন?" তখন আমি বল্লুম—"তাকিয়ে দেখুন, ইংরেজরা কিরকম করে' সূপ খাচ্ছে।" এক নজর দেখে, হাতের চামচ রেখে দিয়ে তিনি আমাকে নমস্কার করলেন। এই ছোকরাটির নাম নলিনী বাঁড়ুজ্যে, আরার বড় উকিল কৈলাসবাবুর ছেলে। বাঙ্গালী, কিন্তু বেহারী বাঙ্গালী। নলিনী ছিলেন সুদর্শন আর অসাধারণ বলিষ্ঠ। পরে তিনি আমার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু হন।

এ ঘটনা উল্লেখ করবার কারণ এইটে দেখানো যে, আমি বিলেত যাবার পূর্ব্বেই ইংরিজী খানাপিনায় অভ্যস্ত ছিলুম। আমি যে তখন পলিটিক্সে ঘোর স্বদেশী ছিলুম তার প্রমাণ

উক্ত টেবিলে আমার অন্য পার্শ্বে একটি ধনী পার্শী যুবক বসেছিলেন; তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কি একজন কংগ্রেসওয়ালা?" উত্তর—"হাঁ।"

এ কথা শুনেই তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন। এবং তিনি ভারতবর্ষীয় কিনা জিজ্ঞেস করায় বল্লেন—না; তিনি পার্শী অর্থাৎ পার্শীয়ান এবং পার্শীয়ান বলেই ইংরেজদের কাছে তাঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তাঁদের ভলন্টিয়র দলে ভর্ত্তি করা হয়, যা অন্য কোন ভারতবর্ষীয়কে করা হয় না। আমি বল্লুম—"ইংরেজরা গ্রীক সাহিত্য পড়ে, এবং গ্রীক ইতিহাস থেকেই তারা তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের অসাধারণ বীরত্বের কাহিনী জানতে পেরেছে। ম্যারাথন ও থার্ম্মপিলিতে তোমাদের বীরত্বের কথা কোন্ শিক্ষিত ইংরেজ না জানে?"

আমাদের কথা শুনে চারপাশ থেকে ইংরেজ ছোকরারা হো হো করে' হেসে উঠল। এর পরে সেই কংগ্রেস-বিরোধী যুবক মৌন অবলম্বন করলেন।

উক্ত কথোপকথনেই প্রমাণ যে, আমি আহারাদি বিষয়ে নকল ইংরেজ হলেও মনোভাবে খাঁটি স্বদেশী বাঙ্গালী ছিলুম। আমাকে পরে কোন কোন সাহিত্য-সমালোচক বিলেত-ফেরৎ বলে' খোঁটা দিয়েছেন। এ অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। পদ্যলেখক আমি সরস্বতীর মাথায় বনেট পরিয়েছি; আর গদ্যলেখক হিসাবে আমার লেখার মাথায় হ্যাট পরিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ তখন বোধ হয় চার-পাঁচখানি মাত্র কবিতাপুস্তক

লিখেছিলেন, যথা: ভগ্নহৃদয়, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ভানুসিংহের পদাবলী আর ছবি ও গান। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি কবি হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এমন কি, তিনি কবি কি না তা সমালোচকেরা আলোচনা করতেন। তাঁর অভক্ত সমালোচকেরা তাঁকে বলত "কি-জানি-কি"র কবি। অপরপক্ষে জনকতক ভক্ত তাঁর চার পাশে জুটেছিল; তাঁদের ভিতর একজন তাঁর নাম বোধ হয় যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, "রবিচ্ছায়া" বলে' একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যা রবীন্দ্রনাথের পদ্যসংগ্রহ। এই ভদ্রলোককে আমি মট্‌স্ লেনের বাসায় প্রথম দেখি। তিনি দাদার সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করতে আসতেন। তারপর বহুকাল তিনি অদৃশ্য হন। পরে তিনি যখন Board of Revenue-র সেক্রেটারি হন, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমভিব্যাহারে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দেখলুম, গবর্ণমেণ্টের বড় চাকুরে হয়েও তাঁর রবি-ভক্তি সমান বজায় আছে।

অক্রূর দত্ত লেনে সাবিত্রী লাইব্রেরি বলে' একটি সাহিত্য সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সেকালের সাহিত্যিকেরা, যথা—চন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদি, মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করতে আসতেন। অক্রূর দত্তের বাড়ীর একটি যুবক আমাদের বাসায় দু-একদিন এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে সে সভায় বক্তৃতা করবার জন্য অনুরোধ করতে। তিনি যে সাহিত্য বিষয়ে কিছু জানতেন, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। আমার ধারণা, তিনি

হেয়ার স্কুলে আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন। তারপর লেখাপড়া ছেড়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের অপর দু-চারজন বন্ধু ছিলেন, যথা: প্রবোধ ঘোষ ইত্যাদি। তাঁরা অবশ্য সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। এঁদের বিষয় বিশেষ কিছু বলবার নেই। তারপর রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যরসিক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর কথা পরে বলব।

আমার মনের চরিত্র কি করে' আস্তে আস্তে গ'ড়ে উঠল, সে কথা আমি পূর্ব্বে বলেছি। আমি এফ. এ. পাস করবার পর কলেজ ত্যাগ করিনি। থার্ড ইয়ার ক্লাসটা আমি সেণ্ট জেবিয়ার্সেই পড়ি। তখন কলেজ পার্ক স্ট্রীটে উঠে গেছে। Father Moulmein নামক একটি যুবক পাদরি আমাদের ফিলজফি পড়াতেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অতি পরিষ্কার। তাঁর তুল্য সাইকোলজি পড়াতে আর কোন অধ্যাপক পারতেন না। সেই সময় থেকেই ফিলজফিতে আমার প্রীতি জন্মায়। তারপর ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে প্রেসিডেন্সিতে ফিরে যাই। এবং বি. এ. পরীক্ষায় ফিলজফি অনার্সে আমি ফার্স্ট হই। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিলজফির অধ্যাপক পি. কে. রায় আমাকে বলেন—"তুমি যে ফিলজফি সব ছাত্রের চেয়ে বেশী জান তা নয়; কিন্তু তোমার কাগজ যারা পরীক্ষা করেছে, সেই ইংরেজ অধ্যাপকেরা আমাকে বলেছে যে তোমার মত অপর কেউ অত সুন্দর ও পরিষ্কার করে' লিখতে পারে না।" অর্থাৎ

আমি ফিলজফিতে ফার্স্ট হই আমার ইংরিজী লেখার গুণে। তারপর আমি প্রেসিডেন্সিতে এম. এ. পড়ি। এবং ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান আধিকার করি। এও আমার বিশ্বাস ইংরেজী রচনার প্রসাদে। আমি শেক্সপীয়রের সমালোচনা অন্য কোন সমালোচকের বইয়ে পড়িনি। আমার নিজের মতামত নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছিলুম, যা ইংরেজদের কাছেও গ্রাহ্য হত। এই দুই পরীক্ষাই তা প্রমাণ করে।

ইতিপূর্ব্বে আমি বাঙ্গলা কখনো লিখিনি। আমি যখন এম. এ. পড়ি, তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামক একটি যুবকের অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভায় যোগ দিই এবং সেই সভাতেই জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তার প্রধান বক্তব্য এই ছিল যে, জয়দেব উঁচু দরের কবি ন'ন। আমার এ মত শুনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি অসন্তুষ্ট হ'ন। কিন্তু তাঁরা আমার মতের কোন খণ্ডন করিতে পারেন নি। কবি অক্ষয় বড়াল সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, 'এতকাল পর বাঙ্গলায় একটি নূতন লেখকের আবির্ভাব হল।' সে প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করি। ভারতীর সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি উক্ত প্রবন্ধের অনেকাংশ বাদ দিয়ে সেটি ছাপান। সেই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমার ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে রাখি। এবং বহুকাল পরে সেটি 'সবুজ পত্র'-এ পুনঃ প্রকাশিত করি। এর কারণ,

সেটি আবার পড়ে' দেখলুন যে আমি আমার মত পরিবর্ত্তন করিনি। সেটি অবশ্য তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, আমার লেখার সব দোষগুণই তাতে বর্ত্তমান।

এর পর থেকেই আমি বাঙ্গালা লেখক হয়ে উঠলুম। আমার বি. এ. ও এম., এ. পরীক্ষার ফল শুনে রবীন্দ্রনাথ মহা খুশী হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেছে, এটি তাঁর পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়। আমি যখন এম. এ দিই, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্য বিলেত গিয়েছিলেন; যার বিবরণ তাঁর য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে পাওয়া যায়। তিনি বিলাত থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমার এম. এ. পরীক্ষার ফল বোধ হয় প্রকাশিত হয়।

এর পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় Prosper Merime'e-র 'Etruscan Vase' নামক একটি গল্প তর্জ্জমা করে' 'ফুলদানি' নাম দিয়ে প্রকাশ করি। সেটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় আমাকে আক্রমণ করেন। দুটি কারণে, প্রথমত, 'ফুলদানি'র মত গল্প বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভূত করা অনুচিত বলে'; দ্বিতীয়ত, পাকা ফরাসী লেখকের লেখা কাঁচা বাঙ্গলা লেখকের অনুবাদে শ্রীভ্রষ্ট করা হয়েছে বলে'। আমি শেষোক্ত আপত্তি গ্রাহ্য করি। কিন্তু এ জাতীয় গল্প যে বঙ্গসাহিত্যে চলতে পারে না, সে কথা

মানিনি। আমি অবশ্য সে সমালোচনা পড়ে' একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এরকম সমালোচনা আশা করিনি। তার পরেই আমি মেরিমে'র 'কার্মেন' তর্জ্জমা করি। কিন্তু সেটি শেষ করতে পারিনি বলে' প্রকাশ করিনি। কার্মেন অনুবাদ করবার কারণ, তার বিষয়বস্তু 'ফুলদানি'র চাইতে ঢের বেশি অসামাজিক। সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজম্‌কে আমি কোনকালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি। তার পরিচয় আমার 'জয়দেব' নামক প্রবন্ধেও পাবেন।

এম. এ. পাশ করবার পর আমি প্রায় ছ'বৎসর বেকার বসেছিলুম। কিছুদিন পর আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে State Scholarship নেব কি না, তাই জানবার জন্য একখানি পত্র পাই। এ বৃত্তি তারই প্রাপ্য যার বয়স পঁচিশ বৎসরের কম। আমি উত্তরে লিখি যে, আমার বয়স পঁচিশের ছ'-এক মাস বেশি। এ কথা লেখার দরুন রেজিস্ট্রার ম্যান্ সাহেব আমার উপর বিরক্ত হন। আমি তাঁর অতিশয় প্রিয় ছাত্র ছিলুম। এর পর বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপালের চাকরি নিতে রাজী কি না জানবার জন্য তিনি আমাকে চিঠি লেখেন। কিন্তু রাজী হই নি। তার

কিছুদিন পর তিনি আমাকে কুচবেহার কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করে লেখেন ; তার বেতন মাসিক পাঁচশ টাকা। দাদা আমাকে এ চাকরি নিতে পেড়াপিড়ি করেন। কিন্তু আমি ইতস্তত করতে লাগলুম। বাবা তখন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। দাদা তাঁকে এ প্রস্তাবের কথা বলেন। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এ চাকরি নিতে আপত্তি কি ?"—আমি বললুম, "পরের চাকরি করতে আমার মন সরে না।" বাবা বললেন, "প্রমথ যখন বিবাহ করেনি, তখন তার অনিচ্ছায় আমি তাকে পরের চাকরি নিতে বাধ্য করতে চাইনে।" তাই ম্যান সাহেবের এ প্রস্তাবও আমি অগ্রাহ্য করলুম।

কলেজ থেকে বেরিয়েই পাঁচশ টাকা মাইনের চাকরি কেন যে আমি প্রত্যাখ্যান করলুম, তা বলতে পারিনে। সম্ভবত কর্ম্মবিমুখতাই এর প্রকৃত কারণ।

তারপর আমি জনৈক প্রসিদ্ধ অ্যাটর্নি আশুতোষ ধরের আফিসে articled clerk হই। এবং বিলেত যাওয়া পর্য্যন্ত নামমাত্র সে আপিসেই কাজ করি।

প্রথম থেকেই আমি অ্যাটর্নি আপিসের চেহারা দেখে ভড়কে যাই। এত ধুলো, আর র‍্যাকের উপর এত মোটা মোটা ও এত জীর্ণ খাতা ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখিনি। আইন হয়ত বই প'ড়ে শেখা যায় ; কিন্তু আইনের কাজকর্ম্ম কি ভাবে চলে, তার অভিজ্ঞতা এই আপিস থেকেই আমি অর্জ্জন করি।

আর নানারকম লোককে দেখি। তারা প্রায় সকলেই বাঙাল এবং সম্পত্তি কেনাবেচা ও বন্ধক দেবার দালাল। তাদের ভিতর কেউ সৎলোক নয়, এবং নানারকম জুয়োচ্চুরি করতে প্রায় সকলেই প্রস্তুত। এমন কি, একের সম্পত্তি অন্যের বলে বন্ধক দিতেও পিছপাও নয়। আমি এই আপিসের দলিল ঘাঁটতে ঘাঁটতে আবিষ্কার করি যে, কলকাতার কোনো বড় বাড়ি দু-তিন পুরুষের বেশি এক পরিবারের সম্পত্তি থাকে না। আদি মালিকেরা প্রায় আর্ম্মানী, ইহুদী বা ইংরেজ। আর আমি অনেক ধনী ছোক্‌রাকে দেখেছি, যারা পাঁচ-ছয় বছরের ভিতর পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা কাপ্তেনি করে উড়িয়ে নিঃস্ব হয়েছে। অ্যাটর্নির আপিসে কাজ ক'রে idealist হওয়া যায় না। এই কারণেই বোধ হয় আমি idealist লেখক নই।

সে যাই হোক্, এম. এ. পাশ করবার পর নানাস্থানে, যথা—দার্জ্জিলিং, আসানসোল, সীতারামপুরে ঘুরে বেড়াই। দার্জ্জিলিং যাই বরফ দেখবার জন্য, আর সীতারামপুর প্রভৃতিতে ছোটখাটো কয়লার খনি দেখবার জন্য। অথচ বেকার সময়টাতে আমি কতকটা স্বশিক্ষিত হই। এই সময় আমি আবার সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করি। ইস্কুলে মুখস্থ করেছিলুম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও কলেজে ব্যাকণকৌমুদী। এ দু'খানি ব্যাকরণের যে অংশ আমার মনে ছিল, তাতে সংস্কৃত পাঠের বিশেষ সাহায্য হয়েছিল।

আমি Manzato নামক জনৈক ইতালীয় violinist-এর

কাছে ইতালীয় ভাষা শিখতেও আরম্ভ করি। তিনি লেখাপড়া কিছু জানতেন না। সুতরাং তাঁর স্ত্রী আমাকে পড়াতেন। মহিলাটি ইংরেজী জানতেন না। ফলে আমি ইতালীয় ভাষায় কথোপকথন করতে বাধ্য হই।

এই সময়ে আমি দু'বার মধ্যপ্রদেশে রাইপুর যাই। আমার ভাগ্নী প্রিয়দম্বা দেবীর স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানকার একজন বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। একবার তাঁদের বাড়ীতে একমাস থাকি, আর একবার দু'দিন।

ইতিমধ্যে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজসাহী যাই। লোকেন পালিত তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সম্ভবত দিন পনেরো আমরা দু'জনে তাঁর অতিথি হয়ে থাকি। পরে আমরা নাটোর ফিরে আসি। আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার নিজ গ্রাম হরিপুরে যাওয়া, এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য কলকাতায় ফিরে যাওয়া। নাটোরে বোধ হয় আমরা দিন সাতেক থাকি। নাটোরের মহারাজার সঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বে কলকাতায় আমার পরিচয় হয়। আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী বসেছিলুম, এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে যে, দুটি বাবু এসে হলঘরে বসে আছেন। দাদা বল্লেন—'প্রমথ, দেখ ত কে।' আমি ঘরে ঢুকে দেখি যে, একজন সুপুরুষ এবং তাঁর বেশভূষা অতি-পরিপাটি। তিনি হচ্ছেন নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন রাজশাহীর উকিল অক্ষয় মৈত্র, "সিরাজদ্দৌলা"র লেখক। আমি আর

মহারাজা উভয়েই প্রথম দর্শনে পরস্পরের love-এ পড়ে যাই। এবং সেই দিন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা অতি অনুরক্ত এবং অন্তরঙ্গ ছিলুম। মহারাজা ছিলেন দূরসম্পর্কে আমার আত্মীয়। এবং আমাদের উভয় পরিবারের বহুকাল থেকে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাবার শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়। তাই তিনি বাল্যকালে তাঁর মাসি মহারানী কৃষ্ণমণির কাছে নাটোরে লালিত পালিত হন। এবং নাটোর-রাজের যখন ভগ্নদশা উপস্থিত হয়, তখন আমার ঠাকুরদাদা ও মহারানী কৃষ্ণমণির ভ্রাতা, এই দুই শালা-ভগ্নীপতিতে মিলে তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করবার চেষ্টা করেন। এসব আমার শোনা কথা। তবে আমার ঠাকুরদাদা যে এই ব্যাপারে নাটোরে জেলে গিয়েছিলেন, এ কথা সত্য। এই সব কারণেই নাটোর-রাজপরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক এত দৃঢ় হয়েছিল। দাদা বিলেত যাবার পর রানী কৃষ্ণমণির পুত্রবধূ ও বাবার মাতৃস্থানীয়া রানী শিবেশ্বরী দাদাকে বিলেত থেকে ফিরিয়ে আনতে ও প্রায়শ্চিত্ত করতে বাবাকে আদেশ করেন। বাবা তাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তখন আমি হেয়ার স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ি। তারপর থেকে আমাদের দুই পরিবারের পরস্পরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর আমি এম. এ. পাশ করবার পর যুবক জগদিন্দ্রনাথ রায় নিজে থেকে আমাদের বাড়ীতে এসে সেই ভাঙা-সম্পর্কে আবার জোড়া লাগান।

আমরা রাজশাহী যাবার অব্যবহিত পরে মহারাজা সেখানে এসে উপস্থিত হন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা অক্ষয় মৈত্র এবং তিনি লোকেন পালিতের বাড়ীতে আসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্পসল্প করতে। এই সময়ে আমরা আবিষ্কার করি যে, মহারাজার ভদ্রতা অসাধারণ। ভূভারতে এমন জিনিস নেই, যা নিয়ে আমরা আলোচনা না করতুম। সে আলোচনায় মহারাজাও যোগ দিতেন। এই সূত্রে আমরা আরও আবিষ্কার করি যে, মহারাজা অতি বুদ্ধিমান। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের শরীর খুব ভাল ছিল না। তিনি সন্দেহ করতেন যে, তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়েছে। আমি সে ভয় কখনো পাইনি। আমার মনে হতো সেটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ mood মাত্র, যাকে তিনি হৃদ্‌রোগ ব'লে ভুল করতেন।

সে যাই হোক, আমাদের এই সান্ধ্যসম্মিলনে লোকেন আর আমি ঘোর তর্ক করতুম। তার কারণ, লোকেনের সঙ্গে আমার কি সাহিত্য, কি আর্ট, কি ফিলজফি—কোনো বিষয়েই মতের মিল ছিল না। লোকেন মধ্যে মধ্যে Mill's Examination of Hamilton আমাদের পড়ে শোনাতে চেষ্টা করত;—যা আমার অসহ্য বোধ হত, এবং রবীন্দ্রনাথেরও তাই। আমি একটি কথায় তার মিল পড়া বন্ধ করে দিই। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাস করি—'মিল কে?' তার উত্তরে সে বলে,—'মিল কে তুমি জান না?' আমি উত্তর করি, 'নামও কখনো শুনিনি।' লোকেন বললে, 'তাহলে তোমার

কাছে মিল পড়া ব্যর্থ।' আমার একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্য করলেন। এর পর লোকেনের মিল পড়া বন্ধ হ'ল। রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে কোনোরূপ লেখাপড়া করতেন না। কিন্তু মনে মনে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করতেন। সে বইয়ের নাম পঞ্চভূতের ডায়ারি; যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং আমাদের তর্কের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। লোকেনের সঙ্গে তর্কে আমার মতামতের অনুকূল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং মহারাজ।

রাজশাহী থেকে নাটোর ফিরে আসবার পর দাঁতের ব্যথায় রবীন্দ্রনাথ অতি কাতর হয়ে পড়েন। এবং মহারাজ যদু লাহিড়ী নামে তাঁর একটি আমলাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। যদু তিন দিন তিন রাত অবিরত তাঁর শুশ্রূষা করে। রবীন্দ্রনাথ ভালো হয়ে উঠলে তিনি ও আমি কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করবার সংকল্প করি। কারণ ইতিমধ্যে আমি বাড়ি থেকে চিঠি পাই যে, হরিপুরে ওলাউঠার প্রকোপ হয়েছে, আমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। এম. এ. পাশ করবার পর যে দু'বৎসর আমি বাড়ি বসেছিলুল, সে দু'বৎসরে আমি নানারকম অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করি। ছিলুম কলেজের ছোক্‌রা, হয়ে উঠলুম একটি সামাজিক যুবক। আমি ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলুম। মহারাজা ছিলেন যথেষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, ও চমৎকার মৃদঙ্গ এবং বাঁয়াতবলা বাজিয়ে। আমি মহারাজার সঙ্গে তাঁর সমবয়স্থ কলকাতায় বহু লোকের পরিচয় করিয়ে দিই।

এবং তিনিও বাংলার বহু পাড়াগেঁয়ে বড় জমিদারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে বাংলাদেশের idle rich দলের হালচাল সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল হই। মহারাজ এ দলের ভিতর unique ছিলেন। কথাবার্ত্তায় তিনি ছিলেন অতি সুরসিক, এবং repartee-তে সিদ্ধহস্ত, একরকম ধনুর্দ্ধর বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয় আপোষে তলোয়ার খেলতুম। কিন্তু আমরা পরস্পরের উত্তর-প্রত্যুত্তরে কখনো পরস্পরকে আঘাত করিনি। এর থেকে যেন কেউ মনে না ভাবেন যে, আমি সোজা কথা বাঁকা করে বলতে মহারাজার কাছে শিখেছি। আমি আসলে কৃষ্ণনাগরিক। আমি অল্প বয়স থেকেই কথার মারপ্যাঁচ কাকে বলে তা জানতুম।

আমরা রাজশাহী গিয়েছিলুম বোধ হয় শীতকালে। তারপর গ্রীষ্মকালে তৃতীয় বার দার্জ্জিলিং যাই, আর তিন-চার মাস সেখানে থাকি। সঙ্গে ছিলেন বৌঠান (প্রতিভা দেবী), আমার দিদি (প্রসন্নময়ী দেবী) এবং আমার একটি পিসতুতো ভাই, প্যারীমোহন সান্যাল। এক মাস আমি একরকম ঘোড়ার উপরেই ছিলুম। বর্দ্ধমান স্টেটের ম্যানেজার ফণী মুখুজ্যের দুটি ঘোড়া ছিল; একটি স্টেটের, অপরটি তাঁর নিজস্ব। একটিতে চড়তেন ফণী, আর একটিতে আমি। আমরা দুজনে সকাল-সন্ধ্যা ঘোড়া দাবড়ে ঘুরে বেড়াতুম। কখনো যেতুম সিঞ্চল, কখনো যেতুম দার্জ্জিলিঙের সন্নিকট কোন-না-কোন চা-বাগানে। সে সব জায়গায় থাকত অসংখ্য জোঁক।

আমাদের পায়ে পট্টি জড়ানো থাকত, কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে দেখতুম পট্টির উপরেও জোঁক ঝুলছে। আমি ভাল ঘোড়সওয়ার ছিলুম না, কিন্তু ঘোড়া থেকে অদ্যাবধি কখনো পড়িনি। তার একটি কারণ আমার শরীর ছিল হাল্‌কা, আমি জিনের উপর শরীরের balance রাখতে পারতুম। দার্জ্জিলিঙে ঘোড়ায় চড়া বোধ হয় নিরাপদ। আমি পরে অসম্ভব স্থূলকায় বাঙালী ভদ্রলোকদের ভুটিয়া টাট্টু ঘোড়ায় যাতায়াত করতে দেখেছি। সে যাত্রায় প্যারীদাদা আমাদের সঙ্গে একটি টাট্টুতে চড়ে রঙ্গিত যান। রঙ্গিত দার্জ্জিলিং থেকে বোধ হয় দশ-বার মাইল দূরে, ও আগাগোড়া ওৎরাই। অবশ্য তাঁর সইস ঘোড়ার লেজ ধরে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছিল। তিনিও নিরাপদে রঙ্গীত নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছেন। রঙ্গিতের উপর সেকালে দড়ির কিম্বা বেতমোড়া একটি ঝোলানো ব্রিজ ছিল, যেটি পার হয়ে সিকিমে যাওয়া যেত। সিকিমের মেয়েরা দেখতে অতি সুন্দর।

এবার দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে এসে অল্পদিনের ভিতর বিলেত যাই।

যতদূর মনে পড়ে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর আমি বিলেত যাত্রা করি। ১৭ই অক্টোবর তারিখটা বোধ হয় ভুল নয়; কারণ ঐ তারিখেই বছরের পর বছর আমার জীবনে এমন একটা কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা কখনো দুঃখের কখনো বা সুখের কারণ হয়েছে। বিলেতে যাওয়াটা আমার পক্ষে

সৌভাগ্যের কথা কি না, সে বিষয় সন্দেহ আছে। বিলেত না গেলেও আমি এখন যা আছি তাই থাকতুম। আমি বিলেতে কোনো বিশেষ বিষয়ে লেখাপড়া শিখতে যাইনি। দাদা আমাকে বিলেত যাত্রা সম্বন্ধে খুব উৎসাহ দেন। তিনি বলেন, ও একবার বিলেত গেলে he will get a fresh lease of life। আমাকে তিনি বলেন, "বিলেত গিয়ে যেন কোনো য়ুনিভারসিটিতে ভরতি হয়ো না ; তাহলে তুমি এদেশে যেমন কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছ, সেইরকম পাশ করবার চেষ্টা করবে, আর তাতে তোমার শরীর আরো ভেঙে পড়বে। ব্যারিস্টারী পাশ করা কিছু নয় ; সে পরীক্ষায় তুমি অনায়াসে উত্রে যাবে।" এর থেকে বুঝতে পারছেন যে, সেকালে আমার দেহ ছিল 'অতি কৃশ'। কিন্তু বিলেতে যতদিন ছিলুম আমি একদিনের জন্যও কোনো অসুখে পড়িনি। অবশ্য আমি কোনো ডিগ্রী নিয়ে ফিরিনি ; ফিরেছিলুম কতকটা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে এবং ব্যারিস্টারি পাশ করে।

আমি প্রসন্নমনে বিলেত যাত্রা করিনি। বাবা পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। দেশে ফিরে হয়ত তাঁকে আর দেখতে পাব না, এই ভয় ছিল। উপরন্তু তিন-চার বছরের জন্য দেশ ছেড়ে যাবার সময় বোধ হয় সকলেরই মন অকারণে খারাপ হয়। আমাকে জাহাজে তুলে দিতে গিয়েছিলেন আমার সেজদা কুমুদনাথ চৌধুরী, আর আমার বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। আমার দাদা আশুতোষ চৌধুরী সে ক্ষেত্রে

উপস্থিত ছিলেন কি না ঠিক মনে নেই। জাহাজখানি ছোট্ট। ৩৫০০ টনের বেশি নয়। আমাদের কাপ্তেন পথিমধ্যে আমাকে বলেছিলেন যে, এইখানি বোধ হয় P. & O. কোম্পানির সব চেয়ে ভাল জাহাজ। বহুকাল সমুদ্রে ভাসছে; কিন্তু এ জাহাজের কখনো কেনো বিপদ হয়নি। গঙ্গাসাগরের মোহানা পেরিয়ে বেলা বারটা-একটায় মহাসমুদ্রে অবতরণ করলুম। মহাসমুদ্র দেখে আমার প্রথমে মহা আনন্দ হয়। বিকেলের দিকে খালাসীরা দেখি মাস্তুল থেকে সব পাল খুলে ফেলছে। আমি কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলুম, "এর অর্থ কি?" তিনি বললেন, "আমরা ব্যারোমিটার দৃষ্টে মনে করছি যে, একটা ছোটখাটো ঝড় আসছে; তাই আগে থাকতে জাহাজকে সামাল করে নিচ্ছি।"

বিকেলে ঝড় উঠল। সমুদ্রের জল তোলপাড় করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও নাচতে শুরু করলে। এ নৃত্য লাস্য নয়,—তাণ্ডব। ঢেউয়ের পিঠে চড়ে, উপরে উঠে পরক্ষণেই নীচে পড়ে। একে বলে 'পিচ' করা,—'রোল' নয়। এর ফলে প্রথমে গা-বমি করে, তারপরে শয্যাশায়ী হতে হয়। শরীরের এই অবস্থার নাম সী-সিক্‌নেস্। সে অসুখ যে কি কষ্টকর, যিনি নিজে তা ভোগ করেন নি, তাঁকে কথায় বোঝান যায় না। আমি সেদিন সন্ধ্যা থেকে শয্যাত্যাগ করতে পারিনি; পরের দিনও অবস্থা প্রায় সমানই ছিল। জাহাজে আরোহী খুব কম ছিল। সবে পাঁচ-ছয় জন মাত্র।

তার ভিতর আমার পূর্ব্বপরিচিত একটি বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। নাম শশী মুখুজ্যে। তিনি ভাগলপুরের উকিল এবং W. C. Bonnerjee-র ভগ্নিপতি। তিনি বার বার আমার ঘরে এসে খোঁজ নিতে লাগলেন কেমন আছি। একটি ইংরেজ সহযাত্রী—নাম বোধ হয় General Channing—আমাকে এসে বললেন, "এ রোগের কোনো ওষুধ নেই; তবে তুমি যদি একটু একটু শ্যাম্পেন sip কর, তাহলে এই বমির ভাবটা কিছু কমে যেতে পারে।" অপর এক সহযাত্রী ছিলেন সেকালের মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল,—নাম বোধ হয় Dr. Birch। তিনি এসে বললেন, "শ্যাম্পেনে তোমার এ রোগ সারবে না। সমুদ্রের এই তোলপাড় বন্ধ হলেই তোমার এ অসুখ সেরে যাবে।" তার দুদিন পরেই আমরা কলম্বোয় উপস্থিত হলুম। শশীবাবু বললেন, "শুনলুম কলম্বোয় আমাদের দিন তিনেক থাকতে হবে। অস্ট্রেলিয়া থেকে একটি জাহাজ আসবে, সেই জাহাজের জনকতক আরোহীকে আমাদের জাহাজে তুলে নিতে হবে।" তারপর তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আমাকে তাঁর সঙ্গে গিয়ে Galle Face হোটেলে তাঁর অতিথিস্বরূপ থাকতে হবে। আমি সেই হোটেলে গিয়ে উঠলুম; যদিও সেখানে খরচা বেশি। তিনি আমাকে ও তাঁর পুত্র সতীশকে প্রথম দিনটা কলম্বো ঘুরে দেখতে বললেন। কলম্বোয় দেখবার বিশেষ কিছু নেই; শুধু একটি ছোটখাটো মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি দেখে চমৎকৃত হয়ে যাই। এমন শান্ত এবং নির্ব্বিকার মূর্ত্তি

আমি পূর্ব্বে কখনো দেখিনি। সন্ধ্যাবেলা আমি ও সতীশ Cinnamon Gardens দেখতে যাই। এবং গুটিকতক ছোট ছোট মরকুট্টে গাছ দেখে চলে আসি। হোটেলটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। বড় বড় ঘর, সমুদ্রের ধারে। সেখানে একটি breaker ছিল, আর দিবারাত্র তার আওয়াজ কানে আসত। আমি এই প্রথম অনুভব করলুম যে, টেনিসনের Break, break, break—ছোট্ট কবিতাটি কত দূর সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। যথার্থ কবি ছাড়া আর কেউ এটি লিখতে পারত না। সমুদ্রের তটভূমির গায়ে ঢলে পড়ার অবিরত মৃদুধ্বনি মনকে উদাস করে দেয়।

আমার বাবার বন্ধু শশীবাবু বোধ হয় তার পরদিন আমাকে ক্যাণ্ডি নিয়ে যান। ক্যাণ্ডি একটি পাহাড়ের উপর অতি সুন্দর জায়গা। এইখানেই ভগবান বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে। স্থানটি অতি মনোরম। ইংরজী সভ্যতা এই বৌদ্ধ আশ্রমকে প্রায় আক্রমণ করেছে। বৌদ্ধ মন্দিরের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেখলুম একটি মাংসের দোকানে বড় বড় গোরুর ঠ্যাং ঝুলছে। এ দৃশ্য দেখে আমার মন একেবারে বিগড়ে গেল। মনে হল, ক্যাণ্ডি ছিল একটি বৌদ্ধক্ষেত্র, ক্রমে হয়ে উঠছে রাবণের রাক্ষসপুরী। আমরা সেই দিনই কলম্বোয় ফিরে এলুম। পরের দিন শশীবাবু আমাকে কলম্বো থেকে কিছু দূরে আর একটি নতুন হোটেল দেখাতে রেলে করে নিয়ে গেলেন। নামটি ঠিক মনে নেই। সেটি একেবারে সমুদ্রের ভিতর থেকে

গেঁথে তোলা। ইংরেজরা আরাম জিনিসটা বোঝে। সেইদিনই কিম্বা তার পরের দিনই আমি কলম্বো ত্যাগ করলুম।

রাত বারোটায় জাহাজ ছাড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমরা ভারত সাগরে ভাসছি। Ceylon সম্বন্ধে আমার তিন-চার দিনের অভিজ্ঞতা এই: জনগণ সবই বাঙালীর মত দেখতে। তাদের শরীরে শক্তিও নেই, রূপও নেই। শুধু ক্যাণ্ডিতে পথ-চলতি নরনারী অপেক্ষাকৃত হৃষ্টপুষ্ট। সিংহলে গাছপালার পাতার রঙ আমাদের দেশের মতো ঘোর সবুজ নয়, কচি পাতার মতো ঈষৎ তামাটে। বোধ হয় এই কারণেই সেকালে এই দ্বীপের অপর নাম ছিল তাম্রপর্ণী। ভারত সাগর সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই। এ সাগর সে সময় ছিল একরকম প্রশান্ত সাগর। আমি তাই জল ছাড়া আর কিছু দেখিনি, এবং আবিষ্কার করি যে, সমুদ্রের রঙ নীল নয়, সবুজ। আমি সী-সীক্‌নেসের জের টেনে চলেছিলুম। অর্থাৎ সমস্ত দিনই গা-বমি করত। স্টীমারের একটা বিশ্রী গন্ধ আছে। বোধ হয় এঞ্জিনের কয়লার ধোঁয়া এবং রান্নাঘরের মাছ মাংস রান্নার গন্ধ মিলিয়ে এই অপ্রীতিকর গন্ধের সৃষ্টি হয়। Red Sea-র মুখে প্রথম এডেন শহরে গিয়ে নামি। অমন sunburnt শহর আমি পূর্ব্বে কখনো দেখিনি। সমস্ত শহর এবং তার বাড়িঘরদোরের রঙ সব পোড়ামাটির, অর্থাৎ—আমাদের দেশের হাঁড়িকলসির রঙ। রাস্তায় বেদূঈন দেখেছি; তারাও দেখতে বাঙালীরই মতো। কেবল তাদের রঙ বোধ হয়

বাঙালীর চেয়ে ফরসা। কিন্তু রোদের তাতে তাদের চামড়া সব ঝলসে কুঁচকে গিয়েছে।

এডেন ছেড়ে আমরা Red Sea-তে প্রবেশ করলুম। তার বিষয় আমার কিছু বলবার নেই। দুপাশে মরুভূমি আর তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপসাগর এবং তার অন্তরে ছোট ছোট পাহাড় সব ডুবে আছে। সেই সব জলমগ্ন পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যা আমার বিশেষ করে চোখে পড়ে, সে হচ্ছে যে এই সমুদ্রে আরবরা ছোট ছোট ডিঙিতে পাল খাটিয়ে এক হাতে হাল আর এক হাতে পালের দড়ি ধরে তীরবেগে এ-পার ও-পার করছে। আমার এই সব পাল-খাটানো ডিঙি দেখতে খুব ভালো লাগে।

দিন দু-তিন পরে স্যুয়েজ হয়ে আমরা স্যুয়েজ খালে ঢুকলুম। এটি হচ্ছে মরুভূমির ভিতর খাল কেটে জাহাজ চলাচলের পথ খুলে দেওয়া। এই খালই আফ্রিকা ও এসিয়ার স্থলযোগ ছিন্ন করেছে; এবং য়ুরোপ ও এসিয়ার সঙ্গে জলযোগ স্থাপন করেছে। এই স্বল্পপরিসর নালা পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে গড়েছে। আমি এই স্যুয়েজ খালেই নানা জাতের জাহাজ দেখি। তুর্কীদেরও একখানি জাহাজ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। য়ুরোপের তুর্কীরা দেখতে প্রায় য়ুরোপীয়দেরই মতো; তফাৎ এই যে, তাদের মাথায় হ্যাট্ নেই, আছে ফেজ। কিন্তু সম্প্রতি সে প্রভেদও উঠে গেছে। বিকেলের দিকে পোর্ট সইদ-এ পৌঁছলুম। সেখানে গাইডের সঙ্গে শহরটি

দেখতে গেলুম। এই গাইডরা নানা জাতের; কিন্তু তারা সকলেই চার-পাঁচটা য়ুরোপীয় ভাষায় কথা বলতে পারে। পোর্ট সইদ শহরটি একটি বদ্‌মায়েসীর আড্ডা। সেখানে আছে অসংখ্য গণিকালয়। আর ছোট ছোট কাফেতে বসে দেশের ভদ্রলোক সব কফি খাচ্ছে আর backgammon খেলছে। এরা দেখতে আকারে বৃহৎ, ও বেশভূষায় পরিপাটি। তারা সব উচ্চ শ্রেণীর আরব, কি Egyptian বলতে পারিনে।

পোর্ট সইদ পার হয়ে আমরা ভূমধ্য সাগরে গিয়ে পড়লুম। মনে হল যে একটা নতুন পৃথিবীতে এসে পড়লুম। আকাশে আলো কম, এবং বাতাসে শীতের একটু শিরশিরে ভাব আছে। ইটালিকে পাশ কাটিয়ে জাহাজ চল্‌তে লাগল। প্রথম প্রথম দেখেছি শুধু জল। এক জায়গায় কেবল সিসিলি ও ইটালির মধ্যে দিয়ে যখন জাহাজ এগোতে লাগল, তখন এই দুই দেশের তীরভূমি চোখে পড়ল। তারপর ফ্রান্সের দক্ষিণে মার্সেই ছাড়া অন্য কোনো জায়গা দৃষ্টিগোচর হয় নি। আমি লণ্ডন পর্য্যন্ত টিকিট কিনেছিলুম, কিন্তু মার্সেই-এই নেমে পড়লুম; লণ্ডন পর্য্যন্ত বাকি পথটা প্যারিসের ভিতর দিয়ে রেলে যাব স্থির করে। আমার সঙ্গে দুটি সিংহলী যুবকও ঐখানে অবতরণ করলেন। পূর্ব্বে কখনো এঁদের জাহাজে দেখিনি; কারণ তাঁরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, আর আমি ছিলুম প্রথম শ্রেণীর। জাহাজের নিয়মানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীরা প্রথম শ্রেণীর ডেকে আসতে পারে

না। অবশ্য প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের গতি অবাধ। এই সিংহলী যুবকদের মধ্যে একজনের নাম Dr. Baba। তিনি যাচ্ছিলেন এডিনবরাতে চিকিৎসাশাস্ত্র ভালো করে শিখতে। অপরটির নাম মনে নেই। তিনি ছিলেন একজন burgher, অর্থাৎ সিংহলের ফিরিঙ্গী, দেখতে কিম্ভূতকিমাকার ও ঘোর শ্যামবর্ণ। ডাক্তারটি ছিলেন ফরসা, আর তাঁর নাক চোখ সব আমাদেরই মতো। তাঁর মা ছিলেন ইংরেজ মহিলা, আর তাঁর মামা ছিলেন প্যারিসে একজন ব্যবসায়ী।

মার্সেই হচ্ছে সর্বপ্রথম য়ুরোপীয় শহর যা আমি দেখি। সেখানে বোধ হয় বার ঘণ্টা ছিলুম। শহরটি আমার খুব ভালো লাগে। সেখানে ধুলো নেই, গরম নেই; বরং একটু শীতই আছে। লোকমুখে শুনলুম যে, ও-অঞ্চলে bise ব'লে একটি হাওয়া আসে, যা সঙ্গে নিয়ে আসে কন্‌কনে শীত। আমার শীতবস্ত্র সব বাক্সপ্যাঁট্‌রায় বন্ধ ছিল, তাই আমি একটি দোকানে গিয়ে একটি ছাতা ও এক জোড়া fur-lined দস্তানা এবং fur-lined চটি কিনলুম। দাম খুব বেশি দিতে হয়েছিল। বিলেতে গিয়ে পৌঁছলে মেজদা আমাকে এই ব'লে ধমকান যে, আমাকে ফরাসী দোকানদার ঠকিয়েছে; বিলেতে যে জিনিস পাঁচ শিলিংয়ে পাওয়া যায়, আমার কাছে তার জন্যে ত্রিশ শিলিং নিয়েছে। মেজদা তার পর দিনই Hope Bros.-এর দোকানে ছাতাটি যাচাই করতে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে আমাকে বললেন, তারা বলেছে এত দামী ছাতা আমাদের

দোকানে নেই, উপরন্তু বলেছে যে, এ ছাতার দাম ত্রিশ শিলিংয়ের বেশি হওয়া উচিত। বিলেতে যে তিন-চার বছর ছিলুম, আমি ওই তিনটি জিনিসই ব্যবহার করেছি। দেশে ফিরে এসেছিলুম ছাতাটি নিয়ে। ক্রমে তার কাপড় ছিঁড়ে গেলে আমার ভগ্নিপতি ডাক্তার উমাদাস বাঁড়ুজ্যে তার বাঁটটি ছড়ি হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য আমার কাছে চেয়ে নেন। মার্সেই দেখলুম প্রথম শহর যাকে এককথায় জীবন্ত শহর বলা যায়। আমরা সেই রাত্রেই ট্রেনে প্যারিস যাত্রা করলুম। সে দেশের ট্রেনে শোবার কোন বন্দোবস্ত নেই। বড় বড় আরাম চৌকির মত সীটে বসে যেতে হয়। সকালবেলা ফ্রান্সের যে-প্রদেশের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল, সে দেশ অতি মনোরম। দুঃখের বিষয় এই যে, কোন স্টেশনে এক পেয়ালা চা পেলুম না; পাওয়া যায় শুধু কফি। কফি খাবার অভ্যাস আমার ছিল না। এক পেয়ালা চা না পেয়ে আমার ভারি অস্বস্তি করতে লাগল। আমি চা-খোর নাই। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে চা না পেলে ঘুম ভাল করে ভাঙে না। আমি এই তুচ্ছ কথাটির উল্লেখ করলুম এই জন্য যে, আমরা যে যা-ই হই, সকলেই বহু তুচ্ছ অভ্যাসের অধীন। মানুষ যাকে personality বলে, তা কতকগুলি বড় এবং অনেকগুলি ছোটর সমষ্টিমাত্র।

সকালবেলা প্যারিসের Gare de Lyons স্টেশনে একটি ঠিকে গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে শহরের একটি বড় হোটেলের অভিমুখে রওনা হলুম। প্রথম প্রথম রাস্তাঘাট ভাল বা

পরিষ্কার ছিল না। বড় বড় লরিতে শাকসবজি তরকারি ইত্যাদি যাচ্ছে। শেষটা Boulevard des Italiens-এ পৌঁছলুম। চমৎকার রাস্তা। ছ'পাশে Cafe Riche প্রভৃতি বড় বড় রেস্তোঁরাঁ। গিয়ে নাবলুম Grand Hotel-এ। প্রকাণ্ড হোটেল, এবং আরামের সাজসরঞ্জামের কোন অভাব নেই। দিনটা কি করে' কাটালুম মনে নেই। সন্ধ্যার পর হোটেলের স্থমুখেই Opera House-এ গেলুম। আমি বিলাতী সঙ্গীতের কোনকালেই সমজদার ছিলুম না। কিন্তু Wagner-এর Valkyrie-র Overture শুনে মনে হ'ল যেন অন্য এক লোকে চলে গেছি। তিন-চার 'শ'খানা বেয়ালা একসঙ্গে বাজছে নানা ভিন্ন স্থরে; অথচ এ-সব স্থর পরস্পরে বিবাদ করে না, সকলে মিলেমিশে সঙ্গীতের ঝড় বইয়ে দেয়। এই বিরাট এবং প্রচণ্ড সঙ্গীতে লোকের কান চেপে ধরে তোল্লা তোল্লা করে এমন এক লোকে নিয়ে যায়, যেখানে গানের উনপঞ্চাশ পবন উন্মত্ত হয়ে তাণ্ডবনৃত্য করছে। এই য়ুরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীতের ভিতরকার কথা হচ্ছে ধ্বনির পরিমাণ বাড়ানো; অপর পক্ষে আমাদের দেশের সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ধ্বনিকে মৃত্যু থেকে মৃদুতর করা। এককথায় য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অর্থ হচ্ছে স্থরের multiplication আর আমাদের হচ্ছে division। যাঁরা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে হিন্দুসঙ্গীতের আপোষমীমাংসা করতে চান, তাঁরা এ উভয়ের গোড়াকার কথাটা ভুলে যান। আমি য়ুরোপে থাকতে যখনই Wagner-এর কোন অপেরার

অভিনয় দেখেছি, যথা—Tannhauser, তখনই আমার এই একই কথা মনে হয়েছে। য়ুরোপীয় সঙ্গীত আসলে যন্ত্র-সঙ্গীত, এবং ব্যক্তির সঙ্গীত নয়,—সমষ্টির। Politics-এ যাকে বলে totalitarian, তাই। উল্লাসই হচ্ছে এর প্রধান গুণ। আমি প্যারিসে আর কি দেখেছি, তা আমার ভাল মনে নেই। যদি মনে করতে পারি পরে লিখব। আমি বোধ হয় দু'রাত্রি প্যারিসে থেকে তারপর লণ্ডন রওনা হই। সঙ্গে impression নিয়ে আসি শুধু আলোর; এত আলো আমি য়ুরোপের আর কোন শহরে দেখিনি। Parisian-রা নিশাচর। এবং সন্ধ্যাবেলায়ই এই শহর জেগে উঠে বিলাসে মত্ত হয়।